অরণ্যে যুদ্ধ

অরুন্ধতী রায়

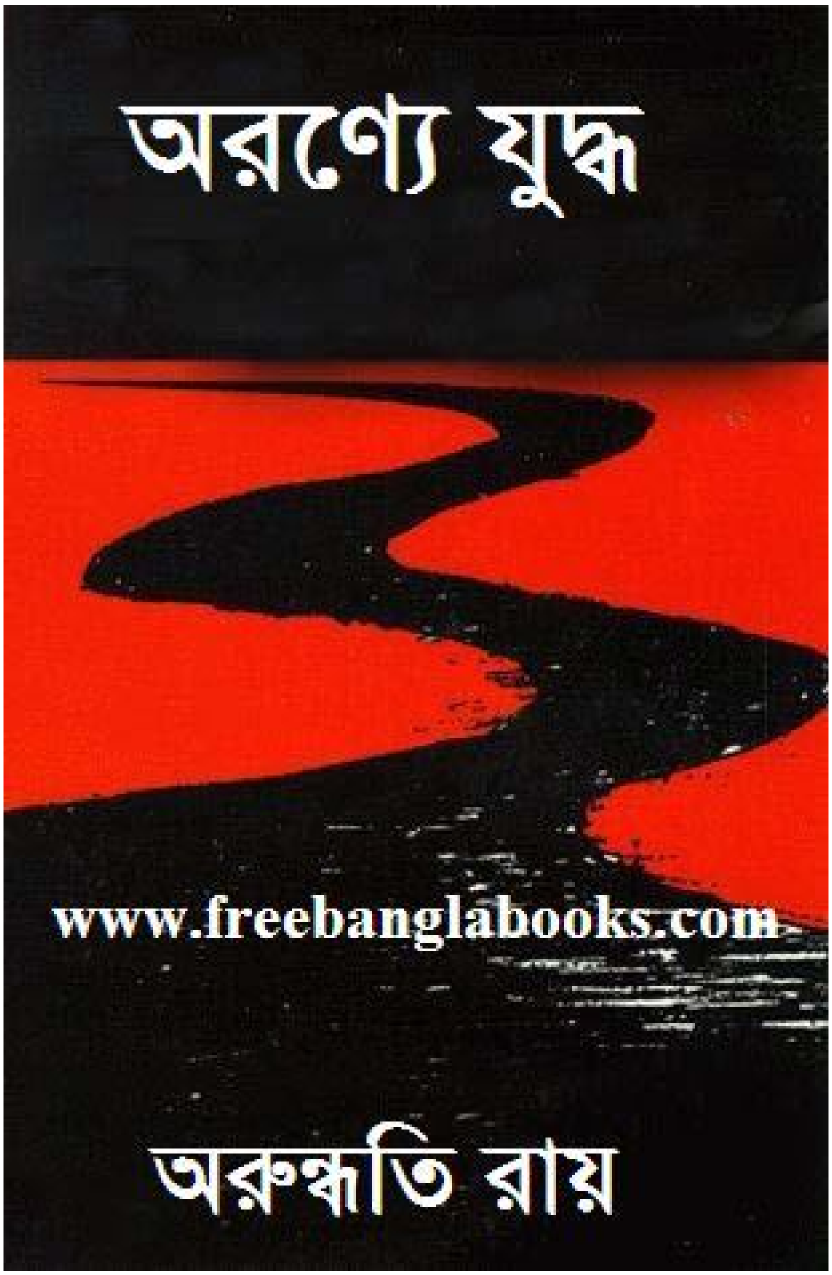

অরুন্ধতী রায়, বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতের প্রখ্যাত লেখিকা ও মানবাধিকার কর্মী। তিনি গত ফেব্রুয়ারিতে অঘোষিতভাবে নিঃশব্দে ঘুরে আসেন সাধারণ মানুষের জন্য নিষিদ্ধ মাওবাদী অধ্যুষিত মধ্য ভারতের যুদ্ধক্ষেত্র দন্ডকারণ্য বনাঞ্চল। এখানে রাষ্ট্র সমর্থিত লুণ্ঠনকারী শোষকদের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে ভূমিপুত্র আদিবাসীরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। এসব সশস্ত্র যোদ্ধা, তাদের পরিবার ও মাওবাদী সহযোদ্ধাদের সঙ্গে লেখিকা সামনাসামনি কথা বলেছেন। সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেছেন পুরো পরিস্থিতি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এক সপ্তাহ অবস্থানকালে যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার এক অসাধারণ বাঙ্ময় বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় দিল্লির 'আউটলুক' সাময়িকীতে। অরুন্ধতী রায়ের এই লেখাটির সংক্ষেপিত ভাষান্তর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হলো ভারতের মধ্যাঞ্চলের জঙ্গলে কি ঘটছে তা সম্যক উপলব্ধির জন্য। **ভাষান্তর : নেয়ামুল হক**

অরুন্ধতী রায় —ইন্টারনেট

ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে যারা বিবেচিত তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা একটি চিরকুট আমার দরজার নিচ দিয়ে ঢুকল। খামে মোড়া, টাইপ করা, সংক্ষিপ্ত আকারের এই চিরকুটটির জন্যে গত কয়েক মাস ধরেই অপেক্ষা করছিলাম আমি।

নির্ধারিত দুটি দিনে মোট চারটি সময় দেওয়া আছে। এর যে কোনো দিনের যে কোনো একটি সময়ে ছত্তিশগড়ের দান্তেয়ারস্থ মা দান্তেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছতে হবে আমাকে। আবহাওয়া খারাপ থাকতে পারে, গাড়ির চাকা ফুটো হয়ে যেতে পারে, অবরোধ থাকতে পারে, থাকতে পারে যানবাহন ধর্মঘটও। অথবা নিতান্তই ভাগ্য অপ্রসন্নতার শিকার হতে পারি। এসব ভেবেই সম্ভবত এতগুলো বিকল্প সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, লেখকের সঙ্গে থাকতে হবে ক্যামেরা, তিলক কাটা কপাল এবং নারকেল। সাক্ষাৎকারীর মাথায় থাকবে টুপি, আউটলুক পত্রিকার হিন্দি সংস্করণ ও কলা। শব্দসংকেতটি হচ্ছে : নমস্কার গুরুজি।

নমস্কার গুরুজি। আমি একটু ধন্দে পড়ে গেলাম। যিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং আমাকে নিয়ে যাবেন তিনি আবার আমাকে একজন পুরুষ মানুষ ভেবে রাখেননি তো। আমার একটি পুরুষ সাজ নিয়ে নেওয়া উচিত কিনা তাও ভাবলাম।

দান্তেওয়ারার বর্ণনা বহুদিক থেকেই দেওয়া যায়। চারদিকে বিরোধের আভাস। যেন ভারতের অভ্যন্তরেই সীমান্তবর্তী দেশের একটি শহরের মতো এর অবস্থা। এটি একটি যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল। সবকিছুই কেমন যেন খাপছাড়া। দান্তেওয়ারার পুলিশদের গায়ে সাধারণ পোশাক আর বিদ্রোহীদের গায়ে ইউনিফর্ম। কারা তত্ত্বাবধায়ক কারান্তরালে আর বন্দিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরে (তিনশ'র মতো বন্দি দুই বছর আগে শহরের পুরনো এলাকায় অবস্থিত জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল)। যেসব নারী ধর্ষিত হয়েছিলেন তারা পুলিশি হেফাজতে আটক, আর ধর্ষণকারীরা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে বাজার এলাকায়।

ইন্দ্রাবতী নদীর অপর পাড়টি মাওবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। পুলিশের ভাষায় এটি হচ্ছে 'পাকিস্তান'। সেখানকার গ্রামগুলো জনশূন্য, তবে জঙ্গলগুলো মানুষে ভর্তি। যেসব শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল তারা এখন ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অরণ্যের ভেতরকার চমৎকার গ্রামগুলোতে স্থাপিত ইটপাথরের তৈরি স্কুল বিল্ডিংগুলোর কোনো কোনোটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, চোখে কেবল পড়ে সেগুলোর ধ্বংসস্তূপ। আর যেসব স্কুল বিল্ডিং এখনও অক্ষত আছে সেগুলো পুলিশে ভর্তি। অরণ্যে যে মরণপণ লড়াইয়ের বিস্তার ঘটছে সে যুদ্ধ ভারত সরকারের জন্যে যেমনি গর্বের তেমনি লজ্জারও।

অপারেশন গ্রিন হান্ট ঘোষণা করেও তা আবার অস্বীকার করা হয়েছে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম (তিনিই এই যুদ্ধের মূল নিয়ন্ত্রক বা সিইও) বলেছেন অপারেশন গ্রিন হান্ট বলে কিছু নেই, এটা মিডিয়ার সৃষ্টি। অথচ এখনো এর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ রাখা হচ্ছে, লাখ লাখ সৈন্যও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যদিও যুদ্ধাঞ্চলটি ভারতের মধ্যাঞ্চলের গভীর অরণ্যে তবুও তার ভয়াবহ প্রভাব আমাদের সবার জীবনেই পড়ছে।

জঙ্গলের বিবদমান পক্ষ দুটি প্রায় সব দিক থেকেই অসম। একপক্ষ বিপুল সংখ্যার আধাসামরিক বাহিনী। তাদের রয়েছে অর্থ, অস্ত্র, মিডিয়া এবং বিশ্বের উদীয়মান এক বৃহৎশক্তির ঔদ্ধত্য।

অপরপক্ষ সাধারণ গ্রামবাসী। হাতে প্রচলিত কিছু অস্ত্র। তবে তাদের পেছনে রয়েছে দারুণভাবে সংগঠিত ও বিশেষ আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ মাওবাদী গেরিলারা। এদের রয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহের অসাধারণ ও দারুণ এক ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস।

ভারতের মাওবাদীরা আর আধাসামরিক বাহিনী বহু পুরনো প্রতিপক্ষ। অনেকবারই তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুঝেছে। গত পঞ্চাশের দশকে তেলেঙ্গানায়, ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকাকুলামে এবং পুনরায় অন্ধ্র, বিহার ও মহারাষ্ট্রে গত আশির দশক থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত। তারা পরস্পরের কৌশলের সঙ্গে পরিচিত এবং একে অন্যের রণ কৌশলগুলো খুব নিবিড়ভাবেই প্রত্যক্ষ করেছে। প্রত্যেকবারই যদিও মনে হয়েছে মাওবাদীরা (অথবা তাদের পূর্বসূরিরা) কেবল পরাজিতই হয়নি, আক্ষরিক অর্থেই তারা শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তথাপি বারবার তারা ফিরে এসেছে। এসেছে অনেক বেশি সংগঠিত হয়ে, দৃঢ়তা নিয়ে, পূর্বেকার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারকারীরূপে। আজ আবারও তাদের উত্থান ঘটেছে এবং তারা ছড়িয়ে পড়েছে ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের খনিজসম্পদে ভরপুর অরণ্যাঞ্চলগুলোতে। এই অঞ্চলগুলোই ভারতের কোটি কোটি আদিবাসীর আবাসস্থল। একই সঙ্গে এটি আবার বিশ্ববেনিয়াদের (কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের) স্বপ্নের ভূমিও।

উদারদৃষ্টিতে দেখলে বলাই যায় যে, জঙ্গলের এই লড়াইটি চলছে ভারত সরকার এবং মাওবাদীদের মধ্যে। মাওবাদীরা নির্বাচনকে ধোঁকাবাজি আর পার্লামেন্টকে শূকরের খোঁয়াড় হিসেবে অভিহিত করে থাকে। প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছে, ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাটি উৎখাত করতে চায় তারা। মাওয়ের জন্মের শত শত বছর আগে থেকেই ভারতের মধ্যাঞ্চলের এই আদিবাসীদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটি ঐতিহ্য রয়েছে। সুবিধার জন্যে সে ইতিহাস ভুলে যাওয়াই ভালো। (তবে সেটিই হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাস। যদি তা না করতো তবে এতদিনে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত)। হু, ওড়াও, কোল, সাঁওতাল, মুন্ডা ও গন্ডরা বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ, জমিদার এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সেসব বিদ্রোহ কঠোর হস্তেই দমন করা হয়েছে, হাজার হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করে। কিন্তু এত কিছুর পরও তারা কোনো দিন বশ্যতা স্বীকার করেনি। এমনকি স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ি গ্রামকে ঘিরে প্রথম যে বিদ্রোহ

www.freebanglabooks.com

সংঘটিত হয়েছিল যেটিকে মাওবাদী বিদ্রোহ বলা যায়, সেই বিদ্রোহেরও প্রধান শক্তি ছিল এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরাই। (সে সময় নকশালপন্থী বলে যে শব্দটি চালু ছিল এখনকার মাওবাদী কথাটি তারই পরিপূরক)। তখন থেকেই নকশালপন্থী রাজনীতির সঙ্গে আদিবাসীদের বিদ্রোহ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। তাই আদিবাসীদের প্রসঙ্গ এলেই নকশাল প্রসঙ্গটিও আসে।

এসব বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সংক্ষুব্ধ একটি জনগোষ্ঠী জন্ম নিয়েছে যাদেরকে ভারত সরকার খুব পরিকল্পিতভাবেই বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত ভারতের সংবিধানটি ১৯৫০ সালে পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। তবে সেটি ছিল ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বিষাদের দিন। সংবিধান ঔপনিবেশিক নীতিকেই স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করে। ভারতের সব আদিবাসী জনগোষ্ঠী রাতারাতি নিজভূমে পরবাসীতে পরিণত হয়। এর মধ্য দিয়ে বনের সম্পদের ওপর আদিবাসীদের এতদিনকার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। এই প্রক্রিয়া তাদের পুরো জীবনযাত্রাকেই বিপর্যস্ত করে দেয়। রাষ্ট্র তাদের ভোটের অধিকার প্রদানের বিনিময়ে বেঁচে থাকার উপকরণ ও জীবনের স্বাতন্ত্র্য কেড়ে নেয়।

ভূমি থেকে উৎখাত করে ভাঁওতাবাজির মাধ্যমে সরকার তাদের এক চক্রাকার দারিদ্রে্যর মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের এই দারিদ্র্যকেই আবার ব্যবহার করা হচ্ছে তাদেরই বিরুদ্ধে। বারবার বাঁধ নির্মাণ, সেচ প্রকল্প ও খনি খননের কারণে বিপুল সংখ্যক আদিবাসী বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব কর্মকান্ড আদিবাসীদের দেশের মূল জনস্রোতে নিয়ে আসার চেষ্টা কিংবা তাদের জীবনে আধুনিক উন্নয়নের ছোঁয়া লাগানো হচ্ছে। ভারতের অভ্যন্তরে কোটি কোটি যে মানুষ স্থানচ্যুত হচ্ছে (বড় বড় বাঁধ প্রকল্পের কারণেই ৩ কোটিরও বেশি মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছে), যারা ভারতীয় অগ্রযাত্রার উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই আদিবাসী। সুতরাং সরকার আদিবাসীদের কল্যাণের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই শংকিত না হয়ে পারা যায় না।

এক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম উদ্বেগের কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের একটি মন্তব্য। তিনি বলেছেন, আদিবাসীরা জাদুঘর সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস করুক তা তিনি চান না। তবে তিনি যতদিন বিশ্ব বেনিয়াদের (কর্পোরেট ব্যবসায়ী) আইনজীবী হিসেবে বড় বড় খনি খনন কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন ততদিন কিন্তু তার কাছে আদিবাসীদের কল্যাণের বিষয়টি মোটেই গুরুত্ব পায়নি। এ ঘটনার মধ্যেই আদিবাসীদের নিয়ে তার এই নতুন উদ্বেগের উদ্দেশ্যটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বিগত পাঁচ বছর কিংবা তারও বেশি সময়ে ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারগুলো বিশ্ব বেনিয়া গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে শত শত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ইস্পাত প্রকল্প, ধাতব কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র , অ্যালুমিনিয়াম পরিশোধনাগার, বাঁধ এবং খনি খনন সংক্রান্ত কোটি কোটি ডলারের এসব সমঝোতা স্মারকের সবগুলোই স্বাক্ষরিত হয়েছে একেবারেই গোপনে। এসব সমঝোতা স্মারককে টাকায় পরিণত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আদিবাসীদের রুখে দাঁড়ানো ছাড়া কোনো উপায় আর রাখা হয়নি। আর সে কারণেই এই যুদ্ধ।

গণতন্ত্রের দাবিদার একটি দেশ যখন নিজের ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরেই যুদ্ধ ঘোষণা করে সে যুদ্ধের রূপটি তখন কী রকম দাঁড়ায়? প্রতিরোধ কি তখন কেবলই কিছু আকস্মিক ঘটনা? তাই কি হওয়া উচিত? কারা এই মাওবাদী? তারা কি কেবলই ভয়ঙ্কর একদল নৈরাজ্যবাদী মানুষ, যারা মান্ধাতার আমলের একটি আদর্শ আদিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে অর্থহীন এক বিদ্রোহের আগুন উস্কে দিচ্ছে? নিজেদের অতীত থেকে তারা কী শিক্ষা পেয়েছে? সশস্ত্র সংগ্রাম আসলেই কি খুব একটা অগণতান্ত্রিক

কিছু? এই যে বলা হচ্ছে, সাধারণ আদিবাসীরা রাষ্ট্র ও মাওবাদীদের মাঝখানে পড়ে ছত্তরখান হয়ে যাচ্ছে – সেটাই বা কতোটা সঠিক? মাওবাদীরা এবং আদিবাসীরা কি তাহলে একেবারেই ভিন্ন ধরনের দুটি ধারা যেমনটা শোনানো হচ্ছে? তাদের স্বার্থ ও লক্ষ্য কি অভিন্ন? তারা কি পরস্পরের কাছ থেকে কিছু শিখেছে? তারা কি একে অপরকে পাল্টাতে পেরেছে?

যেদিন আমি রওনা দেব তার আগের দিন ঘুম জড়ানো চোখে আমার মা 'আমি ভাবছি কী জানো', মায়ের সহজাত ঔৎসুক্য নিয়েই বলছিলেন তিনি, 'এই দেশটির এখন যা প্রয়োজন তাহলো একটি বিপ্লব।'

ইন্টারনেটে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে জানা গেছে, ইসরাইলের মোসাদ বাহিনী ৩০ জন উচ্চপদস্থ ভারতীয় পুলিশ কর্মকর্তাকে পরিকল্পিত হত্যাকান্ড চালানোর ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য, মাওবাদী সংগঠনটিকে নেতৃত্বহীন করে ফেলা। ইসরাইল থেকে নতুন ধরনের কী কী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র (হার্ডওয়্যার) আনা হয়েছে পত্রপত্রিকায় তাই নিয়ে খবরও বেরিয়েছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে লেসার রেঞ্জ ফাইন্ডার, থারম্যাল ইমেজিং ইকুইপমেন্ট এবং চালকবিহীন ড্রোন বিমান যা মার্কিন সেনাবাহিনীতে খুব ব্যবহৃত হয়। গরিবদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য এসবই হচ্ছে সঠিক অস্ত্র।

রায়পুর থেকে দান্তেওয়ারা ঘণ্টা দশেকের পথ। পথের পুরোটাই সরকারি ভাষায় যাকে বলে মাওবাদী উপদ্রুত অঞ্চল। আর এই 'উপদ্রুত' কথাটি খুব সচেতনভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। উপদ্রুত মানে রোগবালাই। সুতরাং এই রোগ সারাতে হবে। বালাই নাশ করতে হবে। মাওবাদীদের নির্মূল করতে হবে। আর এভাবেই আপাত সরলপথে ও চুপিসারে গণহত্যা শব্দটি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক ভাষায় ঢুকে যায়। রায়পুর শহর থেকে বের হওয়ার মুখেই বিশাল একটি বিলবোর্ডে বেদান্ত (এই কোম্পানিটিতেই আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক সময় চাকরি করতেন) ক্যান্সার হাসপাতালের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। বেদান্ত উড়িষ্যায় খনি থেকে অ্যালুমিনিয়াম তৈরির কাঁচামাল বা আকরিক বকসাইট উত্তোলন করে এবং সেখানেই তার অর্থে আবার একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। আর এভাবেই নির্বিরোধ ও লুকানো পথে খনি খনন সংস্থাগুলো আমাদের চিন্তা- চেতনার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। আমরা ভেবেছি, বিশাল, সুশীল এসব সংস্থা সত্যি সত্যি আমাদের ভালো- মন্দ নিয়ে ভাবে, কাজ করে। এসবকেই কর্পোরেটদের সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আর এই সামাজিক দায়বদ্ধতার আড়ালে যে ভঙ্গুর অর্থনীতি চালু হয়েছে তার উপরই জন্ম নিয়েছে ভারতের খনি খনন সংস্কৃতি। যেমন বেসরকারি একটি খনন কোম্পানি প্রতি টন আকরিক লোহা উত্তোলন বাবদ ৫ হাজার রুপি কামাই করে। বিপরীতে প্রতিটন লোহা থেকে রয়্যালটি হিসেবে সরকার পায় মাত্র ২৭ রুপি। অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক বক্সাইটের ক্ষেত্রে চিত্রটি আরো ভয়াবহ। এ হচ্ছে দিনে- দুপুরে শত শত কোটি ডলারের ডাকাতি। নির্বাচন, সরকার, বিচারক, পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন, এনজিও এবং দাতা সংস্থাগুলো কিনে নেওয়ার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থই বলতে হবে।

দু'চারটি ক্যান্সার হাসপাতাল এখানে- ওখানে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে রাখলে কিইবা আসে যায়?

ছত্তিশগড় সরকার যেসব সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে সেখানে 'বেদান্ত' নামটি দেখেছি কিনা আমার মনে নেই। তবে আমার ধারণা যেখানেই ক্যান্সার হাসপাতাল আছে সেখানকার মাটির নিচে কোথাও না কোথাও অবশ্যই পাহাড় পরিমাণ বক্সাইটের মজুদ রয়েছে।

কঙ্কার অতিক্রম করার সময় সন্ত্রাসবিরোধী ও জঙ্গলযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি চোখে পড়ল। ব্রিগেডিয়ার বিকে পনওয়ার স্কুলটি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তার কাজ হচ্ছে দুর্নীতিবাজ

www.freebanglabooks.com

ও বদ পুলিশ কর্মকর্তাগুলোকে জঙ্গল- যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলা। স্কুলের সামনে শিলায় খোদিত বাণীটি হল – 'গেরিলাকে গেরিলা হয়েই মোকাবিলা করতে হবে।' প্রশিক্ষণ স্কুলটি থেকে প্রতি ছয় সপ্তাহ অন্তর আটশ' করে স্নাতক পুলিশ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হচ্ছেন। সারা ভারতে অনুরূপ ২০টি স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এসব পুলিশ বাহিনীই ক্রমান্বয়ে সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ব্যাপারটিকে যে যেভাবেই দেখুক না কেন, শেষ বিচারে জনগণই হচ্ছে এদের মূল প্রতিপক্ষ।

নিশুতি রাত। ঘুমিয়ে আছে পুরো জগদল শহর। তবে যুব কংগ্রেসে যোগদানের জন্য রাহুল গান্ধীর আহবান সংবলিত বিশাল আকারের হোর্ডিংগুলো জেগে আছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বারদুই তিনি বাস্তার ঘুরে গেছেন। তবে যুদ্ধ নিয়ে খুব একটা কিছু বলেননি। জনগণও সম্ভবত তাদের যুবরাজকে এ নিয়ে বিরক্ত করতে চায়নি। তার মিডিয়া ব্যবস্থাপকরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থেকেছে। আর এ কারণেই কংগ্রেসদলীয় স্থানীয় এমএলএ মহেন্দ্র অগ্নিসংযোগ করে হাজার হাজার গ্রামবাসীকে ঘরছাড়া করেছে সে বিষয়টি তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি।

সময় মতোই আমি মা দান্তেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছলাম। সঙ্গে ছিল আমার ক্যামেরাটি, ছোট্ট একটি নারকেল এবং কপালে আমার হালকা লাল রঙের তিলক। মনে হল আমাকে দেখে হয়তো লোকজন হাসাহাসিও করতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছোট্ট একটি বালক এগিয়ে এলো। মাথায় টুপি আর পিঠে ঝোলানো স্কুল ব্যাগ। নখে লাল রঙের নেইল পলিশ। আউটলুক- এর হিন্দি সংস্করণ কিংবা কলা কিছুই নেই। 'আপনিই কি তিনি যিনি ভেতরে যাবেন'? জানতে চাইল সে। শব্দ সংকেত নমস্কার গুরুজিও উচ্চারণ করল না। ভেবে পাচ্ছিলাম না কী বলব। সে তার পকেট থেকে বের করে ঘামে ভেজা এক টুকরো কাগজ আমার হাতে দিল। তাতে লেখা আছে 'আউটলুক পাওয়া যায়নি'। তাহলে কলা, কলা কোথায়?

'আমি সেগুলো খেয়ে ফেলেছি। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল' বলল সে। সত্যিই সে ছিল একটি নিরাপত্তা হুমকি। সে জানাল, তার নাম মাংতু। খুব শিগগিরই বুঝতে পারলাম দন্ডকারণ্য নামে যে জঙ্গলে আমি ঢুকতে যাচ্ছি সেখানে এমন অনেক মানুষই আছে যাদের একাধিক নাম এবং ছদ্ম পরিচয় রয়েছে। একটু রোমাঞ্চিতই হচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল নিজেকে হারিয়ে ফেলে ক্ষণিকের জন্যে একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম বুঝিবা। মন্দির থেকে কয়েক মিনিট হেঁটেই বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম আমরা। চারদিকে মানুষের ভিড়। দ্রুতই ঘটছিল সবকিছু। মোটরবাইকে দু'জন লোক। কোনো কথাবার্তা নেই। চোখের ইশারায় পরিচয়পর্ব সারা হয়ে গেল খুব দ্রুত। এরপর শুধু মোটরবাইকে চড়ে বসা আর ইঞ্জিন চালুর সঙ্গে সঙ্গে চাকা ঘুরতে থাকা। কোথায় যাচ্ছি এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমরা স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের বাড়িটি অতিক্রম করলাম। আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ভদ্রলোক বেশ মনখোলা ধরনের মানুষ। আমাকে বলেছিলেন, দেখুন ম্যাম সত্যি কথা বলতে কী, এ সমস্যার সমাধান আমাদের অর্থাৎ পুলিশ বাহিনী কিংবা সামরিক বাহিনী দিয়ে সম্ভব নয়। এদেরকে নিয়ে বড় সমস্যা কী জানেন, লোভ কি জিনিস বা কাকে বলে এই আদিবাসী মানুষগুলো জানে না বা বোঝে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এদের লোভের বশবর্তী করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আশার কিছু নেই। আমি আমার উপরওয়ালাকে বলেছি, বাহিনী সরিয়ে নিয়ে এদের ঘরে ঘরে টেলিভিশন দিয়ে দিন। দেখবেন সব কিছু কেমন সহজ হয়ে গেছে।

দ্রুতই আমরা শহরের বাইরে এসে গেলাম। আমার ঘড়ি অনুযায়ী ঘণ্টা তিনেক চলার পর হঠাৎ এক জায়গায় এসে মোটরসাইকেল থামল। জনশূন্য পথ, দু'পাশে জঙ্গল। মাংতু নামল, আমিও। মোটরসাইকেল উধাও হয়ে গেল। আমি আমার পিঠে জিনিসপত্র ঝুলিয়ে নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ

www.freebanglabooks.com

নিরাপত্তার জন্য হুমকি ছোট্ট সেই ছেলেটির পিছু পিছু জঙ্গলের ভেতর পা বাড়ালাম। খুবই চমৎকার একটি দিন। সোনায় মোড়া জংলী পথ। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা প্রায় ভরাট হয়ে যাওয়া প্রশস্ত একটি নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। সময়টা বর্ষার শুরু। পাড় ধরে দীর্ঘ বালিয়ারি, আর মাঝখানটায় একটা প্রবাহ। হাঁটু পরিমাণ পানি। সহজেই পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। আমি মাংতুর ইশারা মতো এগুতে লাগলাম। নদীর ওপারে হালকা সবুজ রঙের জামা গায়ে যে লোকটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল সে হল চান্দু। তার বয়স মাংতুর চেয়ে একটু বেশি। হয়তো বা বছর কুড়ি। চোখে- মুখে চমৎকার হাসি। সঙ্গে একটি সাইকেল, জেরিকেনে ভরা ফুটানো পানি এবং আমার জন্য আনা অনেকগুলো গ্লুকোজ বিস্কুটের প্যাকেট। পার্টি থেকেই দেওয়া হয়েছে এগুলো। একটু দম নিয়েই আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। যে পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম সেটি আসলে সাইকেল চালানোর জন্যে মোটেই উপযোগী ছিল না। আমরা একবার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠছিলাম, আবার নামছিলাম পাথুরে পথ বেয়ে। তবে পথের পাশে ঝুঁকিপূর্ণ স্টলগুলো আর তাদের চূড়া দেখতে ছিল অসম্ভব সুন্দর। সাইকেলটি যখন আর চালানো যাচ্ছিল না চান্দু তখন সেটিকে মাথার উপর তুলে হাঁটতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল এর বুঝি কোনো ওজনই নেই। একটি গ্রাম্য বালকের এই চলন- বলন দেখে আমি বিস্মিতই হচ্ছিলাম। পরে জেনেছি এলএমজি ছাড়া আর সব ধরনের অস্ত্রই সে চালাতে জানে। কথাটা সেই আমাকে আনন্দের সঙ্গে জানিয়েছিল। মাথার পাগড়িতে ফুল গোঁজা তিনজন লোক, অনেকটাই মাতাল এবং বেশ সুদর্শন, আধ ঘণ্টা পর ভিন্ন পথ ধরার আগ পর্যন্ত আমাদের পাশাপাশিই হাঁটছিল। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিঠের ঝোলার মধ্যে মোরগ ডেকে উঠল। বোঝা গেল তাদের সঙ্গে যে মুরগিগুলো ছিল সেগুলো তারা বিক্রি করতে নিয়ে গিয়েছিল বাজারে। কিন্তু বিক্রি করতে না পেরে এখন ফেরত নিয়ে যাচ্ছে। চান্দু অন্ধকারেই দেখতে পায় বলে মনে হচ্ছিল। তবে পথ চলতে আমাকে আমার টর্চটা বের করতে হল। ঝিঁঝিরা ডাকতে শুরু করেছে। তাদের ডাকে চারদিকে শব্দের একটা মূর্ছনা সৃষ্টি হয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছিল রাতের আকাশটার দিকে একটু তাকাই। কিন্তু ভরসা পাচ্ছিলাম না। কারণ আমাকে মাটির দিকে চোখ রেখে পা টিপে টিপে চলতে হচ্ছিল। এক পা এগিয়েই খুব সাবধানে আরেক পা ফেলা।

কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে ডাকগুলো কতটা দূর থেকে আসছিল ঠাহর করতে পারছিলাম না। ঝুঁকিপূর্ণ পথটুকু পার হয়েই এক পলক আকাশের দিকে তাকালাম। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার মনে হয় খুব তাড়াতাড়িই আমরা থামব। 'তাড়াতাড়িই', চান্দু জবাব দিল। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আমরা হাঁটছি। চারদিকে ছায়াছায়া অসংখ্য গাছ। আমরা পৌঁছালাম। গ্রামটা বেশ খোলামেলা ও ছড়ানো ছিটানোই মনে হল। একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়ির দূরত্ব অনেক। চমৎকার একটি ঘরে আমরা প্রবেশ করলাম। একটা কুপির আগুনকে ঘিরে কিছু লোক বসে আছে। আর ঘরের বাইরে অন্ধকারে বসে আছে আরো অনেক। তবে ঠিক কতজন তা বলতে পারব না। চারদিকে একটা বিড় বিড় শব্দ। লাল সালাম কামরেইড। (লাল সালাম কমরেড) আমিও বললাম লাল সালাম। যারপরনাই ক্লান্ত ছিলাম আমি। গৃহকর্ত্রী ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে সবুজ মটরশুটি দিয়ে রান্না করা মুরগির মাংস আর কিছু লাল ভাত খেতে দিলেন। এককথায় অমৃত। তার শিশুটি আমার পাশেই ঘুমুচ্ছিল। কুপির আলোয় মহিলার পায়ের রুপালি মলটি চকচক করছিল।

রাতের খাবার শেষ করেই আমি আমার স্লিপিং ব্যাগটি খুললাম। তবে চেইন খোলার শব্দটা কেমন একটু বেসুরোই ঠেকল। কে যেন তার রেডিও অন করল। বিবিসির হিন্দি সার্ভিস। চার্চ অব ইংল্যান্ড বেদান্ত'র নিরাসগিরি প্রকল্পে দেওয়া তার বরাদ্দের অর্থ ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ এই প্রকল্প পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাচ্ছে এবং দংরিয়া কন্দ উপজাতির মানুষদের জীবন বিপন্ন করছে। গরুর গলায় ঘণ্টি নড়ার শব্দ, তাদের নড়াচড়া, হাঁসফাঁস করা আর বায়ু ত্যাগের শব্দ আমার কানে আসছিল। পৃথিবীতে সবকিছুই তো ঠিকঠাক মতো চলছে। আমার চোখ বুজে এলো। ভোর ৫টায় আমরা জেগে উঠলাম। ৬টায় রওনা

দিলাম। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আরো একটি নদী পার হলাম। বেশ সুন্দর সুন্দর গ্রামের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম আমরা। প্রতিটি গ্রামেই চোখে পড়ল সারি সারি তেঁতুল গাছ। যেন পরোপকারী দেবদেবীর ছাড়ামূর্তি হয়ে গ্রামগুলোকে পাহারা দিচ্ছে। মিষ্টি অম্ল তেঁতুল। ১১টা নাগাদ সূর্য অনেক বেশি প্রদীপ্ত। এখন আর হাঁটা চলে না। দুপুরের খাবারের জন্যে আমরা একটা গ্রামে থামলাম। মনে হলো চান্দু সেখানকার লোকজনকে চেনে। অল্প বয়স্কা সুন্দরী একটি মেয়ে তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। মনে হল, আমি সঙ্গে আছি তাই সে কিছুটা লজ্জাই পেল। দুপুরে আমরা কাঁচা পেঁপে দিয়ে মসুর ডাল আর লাল চালের ভাত খেলাম। সঙ্গে একটু শুকনো মরিচের গুঁড়াও দিল। এবার সূর্যের তাপ কিছুটা কমে আসার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। একফাঁকে একটু নাকও ডেকে নিলাম। জায়গাটার বাড়তি একটি সৌন্দর্য আছে। চারদিক ছিমছাম, গোছানোর কোনো কিছুতেই বাহুল্য নেই। ভিড়বাট্টাও নেই কোনো রকমের। কালো একটা মুরগি নিচু মাটির দেয়ালের ওপর একবার উঠছে, একবার নামছে। একটা কুঁড়েঘরের তালপাতার ছাউনিটি বাঁশের কঞ্চি বিছিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ঘাসের একটি স্তূপ, দুটি পিপা, একটি তাঁতের বাক্স, ভাঙা একটি ছাতা এবং খালি ও ভাঙাচোরা পিচবোর্ড বাক্সের একটি স্তূপ। এক জায়গায় এসে আমার দৃষ্টি আটকে গেল। চশমাটি পরলাম। পিচবোর্ডের গায়ে লেখা : আইডিয়াল পাওয়ার ৯০ হাই এনার্জি ইমালশন এক্সপ্লোসিভ (ক্লাস- ২) এমডি সিএটি জেড জেড।

২টা নাগাদ আবার আমরা রওনা দিলাম। যে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম সেই গ্রামে এক দিদির (কমরেড বোন) সঙ্গে দেখা হবে এবং পরের গন্তব্য কোথায় তা তিনিই বলে দেবেন। চান্দু এ ব্যাপারে কিছু জানে না। তথ্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রেও হিসাবের কড়াকড়ি। এককভাবে কারো সব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকার সুযোগ নেই। কিন্তু গ্রামে পৌঁছার পর জানলাম দিদি সেখানে নেই। তার কোনো হদিসও কেউ দিতে পারল না। এ প্রথম চান্দুর মাথার ওপর একটা দুশ্চিন্তার মেঘ দেখলাম। আমার অবস্থা আরো একটু শোচনীয়। আমিও বুঝে পাচ্ছিলাম না এখানকার যোগাযোগের ধরনটা কী। ভুল পথেই যদি এগিয়ে থাকি তাহলে কী হবে? গ্রামের একটু বাইরেই পরিত্যক্ত একটি স্কুল বিল্ডিংয়ের পাশে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আচ্ছা এসব গ্রামের সরকারি স্কুলগুলো কেন কংক্রিটের দুর্গের মতো বানানো? জানালার কপাটগুলোই বা কেন ইস্পাত নির্মিত এবং দরজাগুলো বা কেন ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি এবং ভাঁজ করা? এগুলো কেন কাদা আর বাঁশের তৈরি গ্রামের ঘরগুলোর মতো হলো না? কারণ এগুলোকে ব্যারাক এবং বাংকার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। চান্দু বলল, আভুজমাদ অঞ্চলের গ্রামের স্কুলগুলো সব এরকমই...। সে কাঠি দিয়ে মাটির উপর স্কুল বিল্ডিংয়ের একটি নকশা অাঁকল। গায়ে গায়ে লাগানো তিনটি অষ্টভূজ। দেখতে অনেকটা মৌচাকের কুঠুরির মতো। একজন ব্যাটসম্যানের রান সংগ্রহের ওয়াগন হুইলের মতো এঁকে মাঝখানটায় একটা তীর চিহ্ন অাঁকল সে। বলল এখান থেকে সব দিকেই তারা গুলি ছুড়তে পারে। চান্দু জানাল, কোনো স্কুলেই কোনো শিক্ষক নেই। তারা সবাই পালিয়েছে। নাকি তোমরাই তাদের তাড়িয়েছ? না না আমরা কেবল পুলিশকেই তাড়া করি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ঘরে বসে বসেই যখন বেতন পাওয়া যায় তখন আর এ শিক্ষকরা জঙ্গলে আসবে কেন?

সে আমাকে জানাল এটি একটি নতুন এলাকা। পার্টির লোকজন সবেমাত্র এখানটায় প্রবেশ করেছে। জনাবিশেক তরুণ- তরুণী এসে হাজির হল। তাদের প্রায় সবারই বয়স আঠারো- উনিশ কিংবা বিশ- একুশ। চান্দু বুঝিয়ে বলল যে, এরাই হচ্ছে গ্রাম পর্যায়ের মিলিশিয়া। মাওবাদী মিলিশিয়াদের মধ্যে এরাই হচ্ছে পদক্রমের নিম্নতম ধাপ। এদের মতো কাউকে আমি এর আগে আর দেখিনি। তাদের পরনে শাড়ি আর লুঙ্গি। কোন কোনটি একটু ছেঁড়া। জলপাই রঙের। ছেলেরা গয়না পরা, মাথায় পাগড়ি। তাদের প্রত্যেকের কাছেই গুলিভর্তি রাইফেল যা ভার্মার নামে পরিচিত। কারো কারো কাছে আবার রয়েছে ছোড়া, কুড়াল এবং তীর- ধনুক। একটি ছেলের হাতে দেখলাম তিন ফুট লম্বা জিআই পাইপ দিয়ে তৈরি মর্টারের

মতো একটি অস্ত্র। এটি গান পাউডার আর পেরেকে ঠাসা। চাইলেই গুলি করা যায়। এটি চালালে বিকট শব্দ হয় এবং কেবল একবারের জন্যই এটি ব্যবহার করা যায়। তারপরও পুলিশরা এটাকে খুবই ভয় পায় – বলে আর হাসে তারা।

মনে হল না যুদ্ধের ব্যাপারটা নিয়ে তারা খুব বেশি মাথা ঘামায়। কারণটা সম্ভবত এই যে, তাদের এই এলাকাটা সালওয়াজুদুম থেকে একটু দূরে। সবে সারাদিনের কাজ শেষ করেছে তারা। ছাগলগুলো যাতে মাঠে চলে যেতে না পারে সে জন্য গ্রামের কয়েকটি বাড়ির চারদিকে বেড়া তৈরি করে দিয়েছে। চোখে-মুখে তাদের আনন্দ আর কৌতূহলের ছাপ। মেয়েগুলো খুবই সাবলীল এবং ছেলেদের সঙ্গে তাদের আচরণে উচ্ছল উদ্দামতা লক্ষ্যনীয়। সব কিছুর বর্ণনা দিতে পারব না। তবে তাদের দেখে সত্যি আমি মুগ্ধ। চান্দু জানাল, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে চার কিংবা পাঁচটি করে গ্রামে নিরাপত্তা টহল দান, ক্ষেতে খামারে লোকজনকে সাহায্য করা, কুয়া পরিষ্কার করা, বাড়িঘর মেরামত করে দেওয়া কিংবা যখন যা দরকার করে দেওয়া।

এখন পর্যন্ত দিদির কোনো পাত্তাই নেই। কী করা? কিছুই না। শুধু অপেক্ষা। অথবা কাঠচেঁরা কিংবা আগাছা পরিষ্কারে হাত লাগানো। রাতের খাবার শেষে সবাই কথাবার্তা না বলে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। বোঝা গেল আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। সব শিশু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এগুচ্ছে। চাল, তরিতরকারি, হাঁড়ি পাতিল সব। আমরা স্কুল চত্বর ছেড়ে এক কাতারে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করছি। আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে জঙ্গলের একটা ফাঁকা জায়গায় এসে আমরা নামলাম। এখানেই আমাদের রাত কাটাতে হবে। চারদিকে কোনো রকম সাড়াশব্দ নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে সবাই তাদের নীল রঙের প্লাস্টিকের চাদরগুলো পেতে নিল। এগুলোকে তারা 'ঝিল্লি' (এগুলো ছাড়া বিপ্লবের কথা ভাবা যায় না) বলে। চান্দু আর মাংতু দু'জনে মিলে একটাতে শুলো। আর আমার দিকে এগিয়ে দিল একটা। ধূসর বর্ণের পাথরের গা ঘেঁষে সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটা তারা আমার জন্য বেছে দিল। চান্দু বলল, দিদিকে সে খবর পাঠিয়েছে। খবরটি যদি তার কাছে পৌঁছায় তবে একেবারে সকালেই সে এসে হাজির হবে। খবরটা যদি ঠিকঠাক মতো পৌঁছায়।

এত চমৎকার কোনো কক্ষে আমি ঘুমাইনি কোনোদিন। হাজার তারকা হোটেলে আমার ব্যক্তিগত বিলাসবহুল কক্ষ এটি। আমাকে ঘিরে রেখেছে অদ্ভুত সুন্দর ছেলেমেয়েগুলো। কৌতূহলোদ্দীপক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তারা। সন্দেহ নেই, এরা সবাই মাওবাদী। এরা সবাই কি মরতে যাচ্ছে? জঙ্গল- যুদ্ধ প্রশিক্ষণ স্কুল কি তাদের লক্ষ্য করেই তৈরি করা হয়েছে? হেলিকপ্টার, গানশিপ, থারমাল ইমেজিং এবং লেসার রেঞ্জ ফাইন্ডার – এসব কিছু কি তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য? কেন তাদের মরতে হবে? কীসের জন্যে? তাদের জীবন, তাদের সবকিছুকে খনিতে পরিণত করতে হবে – এ কারণে? মনে পড়ে, উড়িষ্যার কঞ্জহারে আমি একবার আকরিক লোহার উন্মুক্ত খনি খনন দেখতে গিয়েছিলাম। একসময় সেখানে জঙ্গল ছিলো। শিশুরা সেসব জঙ্গল ভালোবাসত। কিন্তু সেখানকার ভূমি এখন ঊষর, লাল, ক্ষতবিক্ষত। লাল ধুলায় আপনার নাসিকাযন্ত্র, ফুসফুস ভরে যাবে। এখানকার পানি লাল, বাতাস লাল, মানুষগুলোও লাল। লাল তাদের ফুসফুস, চুল সবকিছু। সারাদিন সারারাত গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে ট্রাক চলছে। হাজার হাজার ট্রাকের আসা যাওয়ার বিকট শব্দ। টনকে টন আকরিক লোহা পৌঁছে দিচ্ছে পারাদ্বীপ বন্দরে। যেখান থেকে এগুলো যাবে চীনে। তৈরি হবে মোটরগাড়ি, ছুটবে ধোঁয়ার তুফান, রাতারাতি গজিয়ে উঠবে বড় বড় শহর নগরী। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন বিশ্বের তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদ প্রবৃদ্ধির হার দেখে। আর এই প্রবৃদ্ধি দিয়েই তৈরি হবে মারণাস্ত্র, নতুন নতুন যুদ্ধের জন্ম দেওয়ার জন্যে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, জেগে আছে কেবল পাহারারতরা। তারা দেড় ঘণ্টার পালা করে পাহারা দেয়। এতক্ষণে উপরের দিকে তাকাতে পারলাম। আকাশভর্তি তারা। আমি তখন খুব ছোট। থাকতাম মিনাচল

www.freebanglabooks.com

নদীর তীরে। সন্ধ্যা হলেই ঝিঁঝি পোকারা ডেকে উঠত। আমার তখন ধারণা ছিল ঝিঁঝির ডাক বুঝি তারাদের শব্দ। এরকম শব্দ করেই বুঝিবা তারা আলো দিতে শুরু করে। এমন একটি জায়গায় এমন একটি অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরে আমি যে কতটা সুখী, কতটা অভিভূত তা বলে বোঝাতে পারব না, পৃথিবীতে এর চেয়ে ভাল কোনো জায়গা আর নেই যেখানে আমি যেতে চাইতে পারি, থাকতে চাইতে পারি, আজ রাতের জন্যে আমি কী হতে চাই, কী হবে আমার পরিচয়? তারকাখচিত আকাশতলে কামরেইদ (কমরেড) রাহেল? দিদি হয়তো আগামীকালই এসে হাজির হবে।

বিকেল গড়ানোর আগেই তারা এসে হাজির হল। দূর থেকেই আমি তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম। ওরা দৌড়াতে দৌড়াতে আসছিল। সংখ্যায় জনাপনেরো হবে তারা। সবার গায়ে জলপাই রঙের সবুজ ইউনিফর্ম। আমাদের দিকেই আসছিল তারা। তারা যে পথ দিয়ে এগিয়ে আসছিল সেদিকে তাকিয়ে এমনকি দূর থেকেই আমি বুঝতে পারছিলাম এরা কঠিন যোদ্ধা। এরা হচ্ছে পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ)। এদের জন্যেই, এদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যেই থারমাল ইমেজিং এবং লেসার নিয়ন্ত্রিত রাইফেল। এদের মোকাবিলায়ই দরকার পড়বে জঙ্গলযুদ্ধপ্রশিক্ষণ স্কুল থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ।

তাদের সঙ্গে ছিল শক্তিশালী রাইফেল, আইএনএসএএস, এসএলআর। দু'জনের কাছে ছিল আবার একে- ৪৭ রাইফেলও। দলটির নেতা কমরেড মাধব। নয় বছর বয়স থেকেই সে পার্টির সঙ্গে যুক্ত। তার বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারাঙ্গলে। দেখে মনে হলো সে খুবই বিচলিত এবং কাচুমাচু ভঙ্গিতে ক্ষমাপ্রার্থী। বারবার করে বলতে লাগল, একটা যোগাযোগ বিভ্রাট ঘটে গেছে, এমনটা কখনো হয় না সাধারণত। আমার আসলে প্রথম রাতেই তাদের প্রধান আস্তানায় পৌঁছার কথা ছিল। যে বাটনটি জঙ্গলে যোগাযোগের যোগসূত্র হিসেবে ব্যবহার হয় সেটি হয়তো কোনো একজন কোথাও ফেলে দিয়েছিল। মোটরসাইকেলে করে আমাকে একেবারেই ভিন্ন এক জায়গায় নামিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। আমরা আপনাকে অপেক্ষা করিয়েছি, অনেক বেশি হাঁটিয়েছি। আপনি এখানে আছেন জানার পর থেকেই আমরা দৌড়াতে শুরু করেছি। পুরোটা পথই দৌড়ে এসেছি। আমি বললাম, না ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করা, হাঁটা আর আপনাদের কথা শোনার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি। সে তাড়াতাড়িই ফিরতে চাচ্ছিল। কারণ ক্যাম্পে লোকজন বসে আছে, তারা সবাই উদ্বিগ্ন। ক্যাম্প সেখান থেকে ঘণ্টা কয়েকের পথ। আমরা যখন পৌছাই তখন প্রায় সন্ধ্যা। কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী সেখানে। টহলরত সার্বক্ষণিক। একশ'র মতো কমরেড দুটি সারিতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র আর সবার স্মিতহাস্য মুখমন্ডল। তারা গাইতে শুরু করল :

লাল লাল সালাম, লাল লাল সালাম আনে ওয়াল সাঁথিও কো লাল লাল সালাম। (আগত কমরেডদের লাল সালাম) গানটি একটি নদীকে নিয়ে লেখা পল্লীগীতি, আবার বনে ফুল ফোটার সময়ও গাওয়া হয়। তবে গানটি গাইছিল তারা বেশ সুমিষ্ট স্বরেই। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল শুভেচ্ছা বিনিময়, হাতে হাত রাখা আর মুষ্টিতে মুষ্টি ঠেকানো। গুন গুন করে গাইছিল তারা লাল সালাম, স্লালছলাআ, স্লালস্লাম। মেঝের উপর পনেরো বর্গফুটের মতো আয়তন বিশিষ্ট নীল রঙের বড় একটি ঝিল্লি পাতা ছিল। এছাড়া ক্যাম্প বলতে যা বোঝায় সেরকম আর কোনো কিছু চোখে পড়ল না। এই ক্যাম্পটির ছাউনিটিও অবশ্য একটি ঝিল্লি দিয়েই তৈরি। আজ রাতের জন্যে এটিই হচ্ছে আমার শয়নকক্ষ।

সারাদিনের পদযাত্রাজনিত ক্লান্তি নিবারণ কিংবা সামনে আরো যে কষ্টকর যাত্রা রয়েছে তার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যই হয়তো আমাকে এই কক্ষটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যাতে আমি নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নিতে পারি। অথবা হতে পারে উভয় কারণেই আমি এই সুবিধাটুকু পেয়েছি। যেভাবেই দেখি না কেন পুরো অরণ্য যাত্রায় মাথার উপর একটি আচ্ছাদন পাওয়ার এই ছিল সর্বশেষ ঘটনা। রাতের খাবারের সময় কমরেড

www.freebanglabooks.com

নর্মদার সঙ্গে আমার দেখা হয়। ক্রান্তিকারী আদিবাসী মহিলা সংগঠনের (কেএএমএস) তিনি প্রধান। তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুলিশ পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পিএলজি- এর কমরেড স্বরজা লম্বায় মাত্র তার এসএলআরটির সমান। কমরেড ম্যাসি (গন্ডি ভাষায় যার অর্থ কালো মেয়ে) কে ধরিয়ে দেয়ার জন্যও পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। আরো পরিচয় হলো মায়াবী চেহারার কমরেড রুপী, কমরেড রাজুর সঙ্গে। আমার পথে যে অঞ্চলটি আমি অতিক্রম করেছি কমরেড রাজু সেই অঞ্চলটির দায়িত্বপ্রাপ্ত। রয়েছেন কমরেড বেনুও (তাকে অবশ্য কখনো মুরলি, কখনো মনু অথবা সুশীল নামেও ডাকা হয়)। বোঝা যায়, এরা প্রায় সবাই শীর্ষ পর্যায়ের কমরেড। হতে পারে তারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কিংবা পলিট ব্যুরোর সদস্য। আমাকে অবশ্য স্পষ্টভাবে এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। আমরা নিজেদের মধ্যে গন্ডি, হালবি, তেলেগু, পাঞ্জাবি এবং মালায়ালাম ভাষায় কথা বলছিলাম। ম্যাসিই কেবল ইংরেজি বলতে পারত। (আমরা সবাই হিন্দিতেই বলছিলাম)। কমরেড ম্যাসি দীর্ঘাঙ্গী এবং শান্ত প্রকৃতির। মনে হল আমাদের কথাবার্তা বুঝতে তার একটু অসুবিধাই হচ্ছে, আলোচনায় যোগ দিতে কষ্ট হচ্ছে। তবে যেভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরল তা থেকে বুঝতে পারলাম সে একজন ভাল পাঠক। কিন্তু জংগলে পড়ার মতো বই সে কোথায় পাবে। আমার উপর আস্থা রাখতে পারলেই কেবল পরে সে আমাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাবে। একটা দুঃসংবাদ এলো যেমনটা এই জঙ্গলে প্রায়ই আসে। 'বিস্কুট' হাতে একজন লোক। হাতে লেখা কাগজ, ভাঁজ এবং স্ট্যাপল করা। ব্যাগ ভর্তি এমন অনেক চিঠি। দেখতে অনেকটা চিপস- এর মতো। বিভিন্ন জায়গা থেকে পশু আসা সংবাদ এগুলো। অংগার গ্রামে পাঁচজনকে পুলিশ হত্যা করেছে। তাদের চার জন মিলিশিয়া এবং একজন সাধারণ গ্রামবাসী। এরা ছিল সন্থু পোতাই (২৫), ফুলু বান্দে (২২), কান্দি পোতাই (২২), রামলি বান্দে (২০) এবং দালসাই কোরাম (২২)। কে জানে এই ছেলেগুলোই হয়তো আমার গতকালের তারা ভরা রাত্রি যাপনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল।

ভালো খবরও এলো। বেশ নাদুস- নুদুস এক যুবককে সঙ্গে করে জনাকয়েক গেরিলা এসে হাজির। ক্লান্তই দেখাচ্ছিল তাকে। তবে বাদবাকিরা সব তরতাজা। সবাই তাদেরকে কাজের জন্য বাহবা দিচ্ছিল। যুবকটির চেহারায় কিছুটা লাজুকতা থাকলেও চোখে- মুখে একটা পরিতৃপ্তির ভাব। সে একজন চিকিৎসক এবং জঙ্গলে এসেছে কমরেডদের সঙ্গে কাজ করার জন্য। সর্বশেষ এই দন্ডকারণ্যে যে একজন চিকিৎসক এসেছিল সে বহু বছর আগের ঘটনা। রেডিওতে খবর প্রচারিত হচ্ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক করছেন বামপন্থী চরমপন্থী উপদ্রুত রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে। আলোচ্য বিষয় যুদ্ধ। ঝাড়খন্ড এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রীরা অনেকটাই নিরুদ্বিগ্ন এবং বৈঠকে যোগ দেননি। রেডিওটি ঘিরে বসে থাকা সবাই হাসছিল। আর বলাবলি করছিল, নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হওয়ার সময় থেকেই এমনকি নির্বাচনের পর সরকার গঠন করার দু'এক মাস পর্যন্ত মূল ধারার রাজনীতিকরা বলতে থাকবেন 'নকশালরা, আরে ওরা তো আমাদের সন্তানের মতোই।' কিন্তু ঘড়ি ধরে বলে দিতে পারি, দ্রুতই এরা নিজেদের অবস্থান পাল্টাবে এবং নেকড়ের মতো আচরণ করতে শুরু করবে।

কমরেড কমলার সঙ্গে পরিচিত হলাম। বলা হল আমি যেন ওকে না জাগিয়ে কোনো অবস্থাতেই আমার এই ঝিল্লির বাইরে না যাই। এমনকি চার- পাঁচ ফুট দূরত্বেও নয়। কারণ এই অন্ধকারে সবাই কেমন খাপছাড়া অবস্থায়। একটু এদিক- সেদিক হলেই সর্বনাশ। (আমি তাকে জাগাইনি। কুকুরের মতো ঘুমিয়েছি)। সকাল হতেই কমলা আমার হাতে হলুদ রঙের একটি পলিথিনের প্যাকেট ধরিয়ে দিল। প্যাকেটটির এক কোণা কাঁচি দিয়ে কেটে ফুটো করা। এটা আসলে ছিল এবিস গোল্ড কোম্পানির পরিশোধিত সয়া তেলের প্যাকেট। এখন হয়ে গেল আমার প্রাতঃক্রিয়া সারার মগ। বিপ্লবের পথে কোনো কিছুই নষ্ট করা যাবে না। (এখনো প্রতিদিন সবসময়ই কমরেড কমলার চেহারাটা আমার চোখে ভাসে। মাত্র সতের বছর বয়স তার। হাতে তৈরি একটি পিস্তল তার কোমরে গোঁজা। একেবারে বালকের মতো

দেখতে। হাসিটি কী চমৎকার! কিন্তু পুলিশ ধরতে পারলেই তাকে খুন করে ফেলবে। হয়তো খুনের আগে ধর্ষণও করবে। কোনো কিছু জানতেও চাওয়া হবে না তার কাছে। কারণ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সে একটা হুমকি)। নাস্তার পরই দেখলাম বেনু (সুশীল, মনু, মুরলী) আমার জন্য অপেক্ষা করছে। পা দুটি আড়াআড়ি করে ঝিল্লির ওপর বসে আছে সে। মনে হল নির্বিকার, নির্মোহ। অবাক করা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিশ্ব জগতের দিকে পাড়াগাঁয়ের এই স্কুল মাস্টারটি। আমি ইতিহাসের ওপর একটি পাঠ নিতে যাচ্ছি। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে বলা যায়, এই দন্ডকারণ্য অরণ্যে গত ত্রিশ বছরের ইতিহাস। যে ইতিহাস হচ্ছে দিনে দিনে আজকের এই যুদ্ধাবস্থার জন্ম দেয়ার কাহিনী। কোনো সন্দেহ নেই এই ইতিহাস একটি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু কোন ইতিহাসই বা তা করা থেকে বিরত থাকে? তবে কথা হচ্ছে, গোপন এই ইতিহাস জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া উচিত যদি তাকে বিরোধিতাই করতে হয়। এ নিয়ে খোলামেলা তর্কবিতর্ক হতে পারে। খালি খালি এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ঠিক নয়, যেমনটা এখন চলছে।

আচার- আচরণ ও কথাবার্তায় কমরেড বেনু এমনিতেই একজন শান্ত, দৃঢ়চেতা ও ভদ্র প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু পরে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার যে পরিচয় পেয়েছিলাম তা রীতিমতো আমার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। আজ সকালে সে কয়েক ঘণ্টা কথা বলল, বলা চলে বিরতিহীনভাবেই। সে অনেকটা একজন স্টোর ম্যানেজারের মতো, যার হাতে রয়েছে চাবির একটি গোছা। যে সব চাবি দিয়ে সে একটার পর একটা বাক্স খুলছে আর বেরিয়ে আসছে অসংখ্য কাহিনী, গান ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির আলোকচ্ছটা। কমরেড বেনু সেই সাত সশস্ত্র স্কোয়াডের একটির মধ্যে ছিলেন যারা আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ১৯৮০ সালের জুন মাসে গোদাবরী নদী পার হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে দন্ডকারণ্য জঙ্গলে (পার্টির লোকজন এটিকে ডিকে বলে থাকে) প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সেই প্রথম উনপঞ্চাশ জনের একজন। তারা ছিল জনযুদ্ধ গ্রুপের (জযুগ্রু) সদস্য। এটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী), সিপিআই (এমএল) একটি অংশ। এরাই আদি নকশাল। ওই বছরের এপ্রিল মাসে কন্দাপল্লী সিতারামাইয়ার নেতৃত্বে জনযুদ্ধ গ্রুপ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে আলাদা স্বাধীন পার্টি হিসেবে ঘোষণা দেয়। জনযুদ্ধ গ্রুপ নিজেদের জন্য একটি স্থায়ী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার জন্য তাদের একটি ঘাঁটি প্রয়োজন ছিল। দন্ডকারণ্যকেই সেই ঘাঁটির জন্য বেছে নেওয়া হয়। এরপরই প্রথম স্কোয়াডটিকে সেখানে পাঠানো হয় প্রতিপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া এবং সেটিকে গেরিলা অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্ততি সম্পন্ন করার জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির একটি স্থায়ী সশস্ত্র বাহিনী থাকার প্রয়োজন আছে কিনা এবং 'গণবাহিনী' কথাটি শব্দগত কোনো বিরোধ তৈরি করে কিনা তা একটি পুরনো বিতর্ক। অন্ধ্রপ্রদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে জনযুদ্ধ গ্রুপ একটি স্থায়ী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্ধ্রে তারা লাঙল যার জমি তার আন্দোলন করতে গিয়ে ভূস্বামীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের ওপর নেমে আসে পুলিশি নির্যাতন। পার্টিও তখন উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রশিক্ষিত একটি সশস্ত্র শক্তি ছাড়া এ জাতীয় পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যাবে না।

২০০৪ সাল নাগাদ জনযুদ্ধ গ্রুপ সিপিআই (এমএল) এর অন্যান্য অংশ, যেমন পার্টি ঐক্য (পিঐ) এবং মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্র (এমসিসি)- এর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং বিহার ও ঝাড়খন্ডের বাইরের অধিকাংশ এলাকায় কর্মকান্ড পরিচালনা করতে শুরু করে। বর্তমানে এরাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) হিসেবে পরিচিত।

ব্রিটিশরা যে অঞ্চলটিকে তাদের শ্বেতকায় বাচনভঙ্গিতে গন্ডয়ানা অর্থাৎ গন্ডদের আবাসভূমি নাম দিয়েছিল, দন্ডকারণ্য অঞ্চলটি তারই অংশবিশেষ। বর্তমান মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের সীমানা কিন্তু এই অরণ্যাঞ্চলের মধ্যেই পড়েছে। সমস্যা সৃষ্টি করে এমন একটি

জনগোষ্ঠীকে আলাদা প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে বিভক্ত করে ফেলা একটি পুরনো কৌশল। তবে মাওবাদীরা এবং মাওবাদী গন্ডরা কিন্তু এ জাতীয় রাজ্য সীমারেখার বিষয়টিকে আমলেই নেয় না। তাদের মাথায় রয়েছে ভিন্ন মানচিত্র। অরণ্যের অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় তাদেরও রয়েছে বেছে নেওয়া নিজস্ব পথ। প্রচলিত সড়ক বা পথকে তারা হাঁটার কাজে ব্যবহার করে না। তারা শুধু নিজেদের অবস্থান বদলানোর সময় এ সব রাস্তা আড়াআড়িভাবে পার হয়ে যায়। অথবা আজকাল যেমনটা তারা এম্বুশ বা ওঁৎপেতে থাকার জন্য এ সব রাস্তা বেছে নিচ্ছে। গন্ডরা এখানে (কয়া ও দোরলা উপজাতিতে বিভক্ত) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হলেও ছোট ছোট আরো কিছু জনগোষ্ঠীর মানুষও রয়েছে। জঙ্গলের প্রান্তিক এলাকা, রাস্তাঘাট ও হাটবাজারের কাছাকাছি এলাকাগুলোতে বাস অ-আদিবাসী, ব্যবসায়ী এবং অভিবাসীদের। জনযুদ্ধ গোষ্ঠীই দন্ডকারণ্যে আসা প্রথম মতাদর্শিক কোনো সংগঠন নয়। প্রখ্যাত গান্ধীবাদী বাবা আমতে ১৯৭৫ সালে ওয়ারোরা অঞ্চলে তার আশ্রম ও কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার একটি হাসপাতাল খোলেন। রামকৃষ্ণ মিশনও আভুজমাদের গহীন অরণ্যের গ্রামগুলোতে স্কুল খুলতে শুরু করে। উত্তর বাস্তার অঞ্চলে বাবা বিহারি দাশ উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষদের নতুন করে হিন্দু বানানোর এক আগ্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে শুরু করেন। আর এটি করতে গিয়ে উপজাতীয় সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করা হয়, জন্ম দেওয়া হয় আত্মঅবমাননা ও বিদ্বেষের এবং যোগ করা হয় হিন্দুত্ববাদের মহাপুরস্কার বর্ণাশ্রম। প্রথমেই দীক্ষা গ্রহণ করলেন গ্রাম প্রধান ও ভূমি মালিকরা। যেমন সালওয়া যুদুমের প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্র কারমা। এদের 'দ্বিজ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যার অর্থ ব্রাহ্মণ হিসেবে দ্বিতীয় দফায় জন্মগ্রহণ করা মানুষ। (অবশ্য এটা ছিল এক ধরনের রসিকতা। কারণ নতুন করে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে না। তাই যদি হতো তবে এতদিনে আমরা একক একটি ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হয়ে যেতাম) কৃত্রিম এই হিন্দুত্ব, উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষগুলোর জন্য ততটাই উপকারী যতটা উপকারী তাদের জীবনে গ্রামের বাজারে কিনতে পাওয়া বিস্কুট, সাবান, দিয়াশলাই, তেলের মতো বাহারি পণ্যসামগ্রী। হিন্দুত্ব কায়েম করতে গিয়ে গ্রামগুলোর নাম পর্যন্ত পরিবর্তন আনা হয়েছে সরকারি ভূমি রেকর্ডে। ফলে গ্রামগুলোর এখন দুটি করে নাম। একটি জনগণের দেওয়া এবং অন্যটি সরকারের দেওয়া। যেমন ইন্নার গ্রামের নাম হয়ে গেছে চিন্নারি। ভোটার তালিকায় স্থানীয় উপজাতীয়দের নিজস্ব নাম হিন্দু নামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। (মাসা কারমা হয়ে গেছে মহেন্দ্র কারমা)। যারা এই হিন্দুত্বের মধ্যে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়নি তাদেরকে 'কাতওয়া' (যার অর্থ অস্পৃশ্য) হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। আর এই অস্পৃশ্যরাই পরবর্তী সময়ে মাওবাদীদের প্রধান সমর্থক ও সহায়ে পরিণত হয়।

জনযুদ্ধ গ্রুপ সর্বপ্রথম কাজ শুরু করে দক্ষিণ বাস্তার এবং গড়চিরুলিতে। কমরেড বেনুর বর্ণনায় সে সময়কার প্রথম কয়েক মাসের ঘটনার চিত্র ধরা পড়েছে : গ্রামবাসী তাদের প্রতি সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতো। তাদেরকে তারা নিজেদের ঘরবাড়িতে ঢুকতে দিত না। কেউ তাদের কোনো খাবার বা এতটুকু পানিও দিত না। পুলিশ গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচার করে দেয় যে জনযুদ্ধের লোকেরা চোর। মহিলারা তাদের অলঙ্কারাদি মাটির চুলার ছাইয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখতো। এ সময় ভয়াবহ দমন- নিপীড়নের ঘটনাও ঘটেছিল। ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে গড়চিরুলির একটি গ্রামে বৈঠক চলাকালে পুলিশ গুলি চালালে এতে জনযুদ্ধ গ্রুপের পুরো দলটির সবাই নিহত হয়। সেটিই ছিল দন্ডকারণ্যে পুলিশি অভিযানে প্রথম হত্যাকান্ড। জনযুদ্ধ গ্রুপের জন্য এটি ছিল বড় ধরনের একটি বিপর্যয় এবং এই ঘটনার পর কমরেডরা সেখান থেকে সরে এসে গোদাবরী নদী পার হয়ে আদিলাবাদে অবস্থান নেয়।

তবে ১৯৮১ সালেই তারা আবার ফিরে আসে। টেন্ডুপাতার (বিড়ি তৈরির পাতা) মূল্য বৃদ্ধির দাবিতে তারা স্থানীয় উপজাতীয় জনগণকে সংগঠিত করতে শুরু করে। একেবারে অপরিচিত একটি রাজনৈতিক ভাবাদর্শ দিয়ে জনগণকে সংগঠিত করে এমনিভাবে ধর্মঘট ডাকার মত স্তরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ছিল বিস্ময়কর। ধর্মঘট সফল হয়েছিল এবং প্রতি বান্ডিল পাতার দাম দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছিল ৬ পয়সা। তবে

পার্টির দিক থেকে দেখতে গেলে সবচেয়ে বড় সাফল্যটি ছিল এই যে, পার্টি জনগণের সামনে দেখিয়ে দিয়েছিল, ঐক্যের শক্তি কতটা। আর রাজনৈতিক দেনদরবারের নতুন একটি পদ্ধতিও পার্টি জনগণের সামনে তুলে ধরেছিল। বহু ধর্মঘট ও লড়াই সংগ্রাম শেষে আজকের দিনে প্রতি বান্ডিল টেন্ডু পাতার দাম দাঁড়িয়েছে ১ রুপি (দরটি হয়তো কিছুটা অসম্ভবই শোনাতে পারে। তবে টেন্ডু পাতার ব্যবসা থেকে ব্যবসায়ীরা শত শত কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে।)। প্রতি মৌসুমে সরকার দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদারদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টেন্ডু পাতা সংগ্রহ করার অনুমতি দেয়। সাধারণত ১৫০০ থেকে ৫০০০ ব্যাগ পরিমাণ পাতাকে এক মনাক বোরা বলে। প্রতি মনাক বোরায় প্রায় ১০০০ বান্ডেল পাতা থাকে।

(একথাও ঠিক যে, ঠিকাদাররা তাদের বরাদ্দের চেয়ে বেশি পাতা নিয়ে গেল কিনা তা যাচাই করার কোনো ব্যবস্থাও নেই।) বাজারে পৌঁছার পর থেকে টেন্ডু পাতা কিলো দরে বিক্রি হতে শুরু করে। বান্ডিল থেকে মনাক বোরা এবং তা থেকে কিলোতে রূপান্তরের এই যে আংশিক ফাঁক- ফোকর এবং চাতুর্যপূর্ণ গণনা পদ্ধতি রয়েছে তার সবটাই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে ঠিকাদারের লোকজন। ফলে এখানে নানা ধরনের জাল- জালিয়াতির সুযোগ থেকে যায়। খুব কম করে ধরলেও একজন ব্যবসায়ী মানসম্মত এক ব্যাগ টেন্ডু পাতা থেকে ১১০০ রুপি লাভ করে। (হিসাবে ব্যাগ প্রতি ১২০ রুপি পার্টি কমিশনের অর্থ বাদ দেওয়া আছে।) এই হিসাবে একজন ছোট ঠিকাদার (১৫০০ ব্যাগ পরিমাণ) এক মৌসুমে ১৬ লাখ রুপি অর্থ উপার্জন করে। অপর একজন বড় ঠিকাদার (৫০০০ ব্যাগ পরিমাণ) ৫৫ লাখ রুপি পর্যন্ত লাভ করে। তবে প্রকৃত হিসাব মতে, লাভের এই পরিমাণ আরো বহুগুণ বেশি। পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ত নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় এসব ভয়ংকর হুমকিরা এ থেকেই সামান্য কিছু আয় করে।

কিছু হাসির শব্দ, সেই সঙ্গে নিলেশের আগমন লক্ষ্য করলাম। নিলেশ পিএলজিএ'র একজন তরুণ কমরেড। সে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে আসছে এবং নিজের গায়ে নিজেই চপেটাঘাত করছে। কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলাম পাতার তৈরি ভয়ংকর লাল পিঁপড়ার একটি বাসা তার হাতে। তা থেকে পিঁপড়াগুলো বেরিয়ে তার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তার হাতে- ঘাড়ে কামড়াচ্ছে। নিলেশ নিজেও হাসছিল। কমরেড বেনু আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি কখনো পিঁপড়ের চাটনি খেয়েছ?' লাল পিঁপড়া সম্পর্কে আমার যথেষ্ট ধারণা আছে। কেরালায় সেই শৈশবকাল থেকেই বহুবার এগুলোর কামড়ও খেয়েছি। তবে কখনো এগুলোকে গলাধঃকরণ করিনি। (চাটনি খেতে ভালোই লাগবে মনে হয়। টক। প্রচুর ফলিক এসিডও থাকার কথা)।

নিলেশের বাড়ি বিজাপুর। স্পর্শকাতর সালওয়া যুদুমের একেবারে কেন্দ্রস্থলেই এটি অবস্থিত। নিলেশের ছোট ভাই সালওয়া যুদুমের এক লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় যোগ দিয়ে বিশেষ পুলিশ অফিসারের (এসপিও) চাকরি পেয়ে যায়। বর্তমানে সে তার মাকে নিয়ে বাসাগুদা ফাঁড়িতে বসবাস করছে। তার বাবা তাদের সঙ্গে যেতে চাননি এবং গ্রামেই থেকে গেছেন। ঘটনাটি এক ধরনের পারিবারিক বিরোধেরই সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

পরে সুযোগ মতো নিলেশকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার ভাই ও কাজটি করতে গেল কেন? উত্তরে সে বলেছে, ও তখন বেশ ছোটই ছিল। সে সময় বাধা- বন্ধনহীন জীবন যাপনের সুযোগ পেয়ে লোকজনকে মারধর করতো, তাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। এক ধরনের পাগলামোতে পেয়ে বসেছিল তাকে। ভয়ঙ্কর ধরনের সব কাজকর্ম করে বেড়াতো সে। এভাবেই সে সালওয়া যুদুমে অংশ নেয়। এখন তার অবস্থা ত্রাহী মধুসূদন। আর কখনো গ্রামে ফিরে আসতে পারবে না। সে জানে যে তার ক্ষমা নেই।

www.freebanglabooks.com

আমরা আবার ইতিহাস পাঠে মনোনিবেশ করি। কমরেড বেনু জানায়, পার্টির পরের আন্দোলন সংগ্রামটিই ছিল বল্লারপুর পেপার মিলের বিরুদ্ধে। সরকার এই কাগজের মিলের জন্য ৪৫ বছরের চুক্তিতে বড় ধরনের হ্রাসকৃত মূল্যে থাপারদের ১.৫ লাখ টন বাঁশ সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছিল। (অবশ্য বকসাইটের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল সে তুলনায় এটি নস্যিই, তারপরও)। ২০টি বাঁশের একটি বান্ডিলের জন্য একজন আদিবাসীকে দেওয়া হতো মাত্র ১০ পয়সা। (পাশাপাশি এ থেকে থাপাররা কী পরিমাণ লাভের অংক পকেটে পুরত তার তুলনামূলক হিসাব দেখাতে আমার আর ইচ্ছা করছে না)। দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রাম এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে মিল কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার শেষে বাঁশের সেই ১০ পয়সার দর বেড়ে এখন ৩০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আদিবাসী মানুষগুলোর জন্যে এটি ছিল এক বিরাট অর্জন। অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হওয়ার অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু তারা কেউ কথা রাখেনি। জনগণ তখন থেকেই জনযুদ্ধ গ্রুপের সঙ্গে যোগ দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে। তবে টেন্ডু, বাঁশ কিংবা অরণ্যের অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যকে ঘিরে যে রাজনীতি স্বাভাবিকভাবেই তা মৌসুমভিত্তিক। জনগণের স্থায়ী সমস্যা, তাদের জীবনের আসল অভিশাপ হচ্ছে জমিদারেরও জমিদার, বলা চলে জমিদারের বাপ, বন বিভাগ। সকাল হলেই বন বিভাগের কর্মকর্তারা এমনকি একেবারে কনিষ্ঠ পদমর্যাদার কর্মচারিটি পর্যন্ত তাদের সামনে মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাদের কাজই হলো সাধারণ মানুষকে তাদের জমি চাষে বাধা প্রদান, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, পাতা কুড়ানো, ফলফলাদি সংগ্রহ করতে কিংবা গরু- ছাগল চরাতে না দেওয়া। সেই অর্থে তাদের জীবন ধারনই করতে না দেওয়া। তারা হাতি চরিয়ে তাদের ক্ষেত- খামার নষ্ট করে দিত। আগাছার বীজ ছড়িয়ে ভূমির উর্বরা শক্তি অকেজো করে দিত। সাধারণ মানুষের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হতো, তাদের গ্রেফতার করা হতো, অবমাননাকর অবস্থার শিকার হতো তারা, ধ্বংস করে দেওয়া হতো তাদের খেতের ফসল। হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিকই যে, বনবিভাগের দৃষ্টিতে এই মানুষগুলো বেআইনিভাবে অসাংবিধানিক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত। আর বন বিভাগ এক্ষেত্রে শুধু আইনের শাসন কায়েম করে যাচ্ছে। (স্থানীয় নারীরা যে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে তা অবশ্য তাদের কষ্টকর কর্মক্ষেত্রে বাড়তি একটু আনন্দ- ফুর্তি হিসেবেই বিবেচিত)।

চলমান আন্দোলন সংগ্রামে জনগণের সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণ দেখে পার্টি আশাবাদী হয়ে ওঠে এবং বন বিভাগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এতে জনগণও অরণ্যের ভূমির দখল নিয়ে তাতে চাষাবাদের ব্যাপারে উৎসাহী এবং সাহসী হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ বন বিভাগ প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে পড়ে এবং বনের মধ্যে নতুন যেসব বসতি গড়ে উঠেছে সেগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বন বিভাগ ১৯৮৬ সালে বিজাপুরে একটি জাতীয় উদ্যান স্থাপনের ঘোষণা দেয় যার অর্থ ওই অঞ্চলের ৬০টিরও বেশি গ্রাম উৎখাত হয়ে যাওয়া। অর্ধেকেরও বেশি গ্রাম ইতোমধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং জাতীয় উদ্যানের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ তখন চলছিল। এমনি অবস্থায় পার্টি সেখানে হস্তক্ষেপ করে। পার্টির লোকজন নির্মাণ কাজ ভেঙে ফেলে এবং বাদবাকি গ্রামগুলো থেকে মানুষজনকে উৎখাত করার কাজ বন্ধ করে দেয়। পার্টি বন বিভাগের লোকজনকে সেখানে ঢুকতে বাধা দেয়। এমনও হয়েছে যে, গ্রামবাসী বন বিভাগের কর্মকতাদের আটকে রেখেছে, গাছের সঙ্গে তাদের বেঁধে রেখেছে এবং পিটিয়েছে। এ ছিল যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমিক বঞ্চনার প্রতিষোধকমূলক প্রতিশোধ। ঘটনার এক পর্যায়ে বন বিভাগের লোকজন সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। ১৯৮৬ থেকে ২০০০ সাল সময়ের মধ্যে পার্টি সেখানে ৩,০০,০০০ একর বনভূমি জনগণের মধ্যে পুনর্বণ্টন করে দেয়। কমরেড বেনু জানালেন, আজ দন্ডকারণ্যে ভূমিহীন কোনো কৃষক নেই।

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে বনবিভাগ এখন এক অতীত স্মৃতি। মায়েরা তাদের শিশু সন্তানদের এখন যেসব গল্প শোনান সেগুলোর বিষয়বস্তু হলো দাসত্ব আর অপমানের এক পৌরাণিক অতীত।

তবে বয়স্কদের কাছে বনবিভাগের হাত থেকে মুক্তি মানেই প্রকৃত মুক্তি। এই মুক্তিকে তারা তাদের হৃদয়ানুভূতি দিয়ে অনুভব করে, এর স্বাদও তারা গ্রহণ করতে পারে। এই মুক্তি তাদের জীবনে যা এনে দিয়েছে ভারতের স্বাধীনতাও তা এনে দিতে পারেনি। তাই তারা এমন এক পার্টির পেছনে সংঘবদ্ধ হয়েছে যে পার্টি এই মুক্তির লড়াইয়ে তাদের সঙ্গে, তাদের হয়ে কাজ করেছে।

এখানে আসা সাত স্কোয়াডের পার্টির দল অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে। এর প্রভাব এখন ৬০ হাজার বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত বনাঞ্চলের হাজার হাজার গ্রাম ও লাখ লাখ মানুষের মধ্যে পরিব্যপ্ত। কিন্তু বনবিভাগের চলে যাওয়ার পর থেকে এখানে পুলিশের উপস্থিতি শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে পুনরাবর্তিত রক্ত ঝরার ইতিহাস। রক্ত ঝরছে পুলিশের পাতানো 'এনকাউন্টার' আর জনযুদ্ধ গ্রুপের অ্যাম্বুশ বা ওঁৎপেতে থাকার মধ্য দিয়ে। ভূমি পুনর্বণ্টন নতুন কিছু দায়- দায়িত্বেরও আবার জন্ম দিয়েছে। যেমন সেচের ব্যবস্থা করা, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অবাধে বনভূমি উজাড় হয়ে যাওয়ার ঘটনা মোকাবিলা করা। 'জনকর্ম' এবং 'সামরিক কর্ম'কে আলাদা করে ফেলার একটি সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল।

বর্তমানে জনাতন সরকার (জনগণের সরকার) কাঠামোর আওতায় দন্ডকারণ্যের সব কর্মকান্ড নির্বাহ করা হচ্ছে। এর সাংগঠনিক নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হয়েছে চীন বিপ্লব ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের ইতিহাসের আলোকে। প্রতিটি জনাতন সরকারই একগুচ্ছ গ্রাম থেকে নির্বাচিত, যেখানকার জনসংখ্যা ৫০০ থেকে ৫০০০- এর মধ্যে। এই সরকারের রয়েছে মোট নয়টি দফতর। যথা- কৃষি, ব্যয়ভার উদ্যোগ (বাণিজ্য ও শিল্প), আর্থিক (অর্থনৈতিক), ন্যায় (বিচার), রক্ষা (প্রতিরক্ষা), হাসপাতাল (স্বাস্থ্য), জনসম্পর্ক (জনসংযোগ), স্কুল রীতি বিবাহ (শিক্ষা ও সংস্কৃতি) এবং জঙ্গল। কয়েকটি জনাতন সরকার নিয়ে গঠিত হয় একটি আঞ্চলিক সমিতি। তিনটি আঞ্চলিক কমিটির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি বিভাগ। দন্ডকারণ্যে এ জাতীয় মোট ১০টি বিভাগ রয়েছে।

'বর্তমানে জঙ্গল বাঁচাও নামেও আমাদের একটি দফতর রয়েছে' জানিয়ে কমরেড বেনু বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই সরকারি রিপোর্ট পড়েছেন যেখানে বলা হয়েছে, অরণ্যে নকশাল প্রভাবিত অঞ্চল ক্রমেই বেড়ে চলেছে।'

অথচ মজার ব্যাপার কি জানেন, কমরেড বেনু বলতে লাগলেন, পার্টি বনবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলায় সর্বপ্রথম লাভবান হয়েছে মুখিয়ারা (গ্রামপ্রধান)। এরাই হচ্ছে দ্বিজ সম্প্রদায়। এরা নিজেদের লোকজন ও ক্ষমতা খাটিয়ে যতটা পেরেছে যতদিন পেরেছে বিপুল পরিমাণ ভূমি দখলে নিয়েছে। কিন্তু জনগণ এক পর্যায়ে এসব বিষয়ে নিজেদের মধ্যকার বিরোধের ঘটনাগুলো পার্টিকে অবহিত করল। কমরেড বেনু নির্বিকারভাবে বলে যেতে লাগলেন। পার্টি তখন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভেতরকার সমতা, শ্রেণী এবং ন্যায্যতার বিষয়গুলোর ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠল। এটি দেখে বড় আকারের ভূমিমালিকরা (মুখিয়ারা) প্রমাদ গুনতে শুরু করল। এ ব্যাপারে পার্টির প্রভাব যতই বাড়তে লাগল তাদের প্রভাবও ঠিক ততটাই কমতে লাগল। জনগণও নিজেদের সমস্যা নিয়ে মুখিয়াদের কাছে না গিয়ে ক্রমাগতভাবে পার্টির কাছে আসতে শুরু করল। ফলে শোষণের এতদিনকার প্রক্রিয়াটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল। রীতি অনুসারে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের দিন জনগণকে নিজেদের জমি বাদ দিয়ে আগে মুখিয়াদের জমিতে চাষ দিতে হতো। সে ব্যাপারটি রহিত হল। জনগণ এর পর থেকে মৌসুমের প্রথম বছরটি কিংবা অরণ্যের অন্য কোনো পণ্যও আর তাদেরকেই প্রথমে দিত না। অবশ্যই এর জন্যে কিছু একটা করতে হয়েছিল।

এমনি এক প্রেক্ষাপটেই আবির্ভাব ঘটে ওই অঞ্চলের বড় এক ভূস্বামী মহেন্দ্র কার্মার। তিনি সে সময়ে ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) একজন সদস্য। ১৯৯০ সালে তিনি একদল মুখিয়া ও ভূস্বামীদের নিয়ে জনজাগরণ অভিযান (জনগণকে জাগিয়ে তোলার আন্দোলন) নামে এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। জনগণকে জাগিয়ে তোলার নামে তারা নিজেদের জন্যে প্রায় তিনশ' লোকের একটি পেটোয়া বাহিনী গড়ে তোলেন। এদের কাজ ছিল জঙ্গলে হামলা চালানো, মানুষ খুন করা, লোকজনের ঘরবাড়িতে আগুন দেওয়া এবং মেয়েদের সম্ভ্রমহানি ঘটানো। এ সব অপকর্মে তখনকার মধ্যপ্রদেশ সরকার – তখনো ছত্তিশগড় গঠিত হয়নি- পুলিশি সহায়তা পর্যন্ত প্রদান করেছিল। মহারাষ্ট্রেও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নামে অনেকটা একই ধরনের নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে থাকে। জনযুদ্ধ গ্রুপ এ সময় প্রকৃত অর্থেই জনগণের যুদ্ধের আদলে এসব নির্যাতনের প্রতিবাদস্বরূপ বেশ কয়েকজন দুর্ধর্ষ ভূস্বামীকে হত্যা করে। কয়েক মাসের মধ্যে জনজাগরণ অভিযান, কমরেড বেনুর ভাষায়, এই শ্বেতসন্ত্রাস বন্ধ হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়া মহেন্দ্র কার্মা ১৯৯৮ সালে আবারো জনজাগরণ অভিযানকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছিলেন। এবার অবশ্য আগের বারের চেয়েও তার এই প্রচেষ্টা অতিদ্রুত ব্যর্থ হয়ে যায়।

অবশ্য ২০০৫- এর গ্রীষ্মে ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়। ছত্তিশগড়ের বিজেপি সরকার এপ্রিল মাসে সমন্বিত ইস্পাত কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে দুটি সমঝোতা স্মারক সই করে (চুক্তির শর্তাদি গোপন রয়েছে)। সাত হাজার কোটি রুপির চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ঈশ্বর স্টিলের সঙ্গে যাদের কারখানাটি স্থাপিত হওয়ার কথা বাইলাদিলায় এবং ১০ হাজার কোটি রুপির অপর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় টাটা স্টিলের সঙ্গে। এদের কারখানাটি স্থাপিত হওয়ার কথা লোহানদিগুদা নামক স্থানে। ঠিক ওই মাসেই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মাওবাদীদের ভারতের জন্যে 'ভয়াবহ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকি' বর্ণনা করে তার সেই বিখ্যাত বক্তব্যটি প্রদান করেছিলেন। (সে সময়ে এমন একটি বক্তব্য প্রদান সমীচীন ছিল না। কারণ বাস্তবতা ছিল তার এই বক্তব্যের ঠিক বিপরীত। অন্ধ্র প্রদেশের কংগ্রেস সরকার সবেমাত্র তখন মাওবাদীদের পর্যুদস্ত করেছে। বলা চলে তাদের একেবারে ধ্বংসই করে দিয়েছে। প্রায় ১৬০০ সহযোগীকে হারায় তারা। তাদের তখন চরম বিশৃংখলা ও ছিন্নভিন্ন দশা।) প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে খনি খনন কোম্পানিগুলোর বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। তার বক্তব্য প্রচার মাধ্যমগুলোতেও এমন একটি ধারণার জন্ম দিয়েছিল যে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যে কেউই দাঁড়াতে পারে এবং এতে অন্যায়ের কিছু নেই। ২০০৫-এর জুন মাসে মহেন্দ্র কারমা কুটরু গ্রামে মুখিয়াদের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন এবং সালওয়া যুদুম ঘোষণা করেন (শুদ্ধিকরণ হত্যাযজ্ঞ)। এ ছিল আদিবাসীদের জীবন চেতনা বনাম দ্বিজ/নাৎসি মানসিকতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

জনজাগরণ অভিযানের সঙ্গে সালওয়া যুদুমের একটি পার্থক্য ছিল। এটি ছিল সমাজের একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার একটি কৌশল। সালওয়া যুদুমের লক্ষ্য ছিল জনগণকে তাদের গ্রাম তথা বসতবাড়ি থেকে উৎখাত করে বড় বড় রাস্তার পাশে স্থাপিত তাঁবু বা আস্তানায় বসবাস করতে বাধ্য করা যাতে করে তাদেরকে পুলিশি নজরদারিতে আনা যায় এবং নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। সামরিক পরিভাষায় একে বলে কৌশলগত হ্যামলেটিং বা কৌশলগত প্রয়োজনে এদের চলাচল ক্রমান্বয় ছোট একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। এই কৌশলটির উদগাতা হচ্ছেন ব্রিটিশ জেনারেল স্যার হ্যারল্ড ব্রিগস। ১৯৫০ সালে ব্রিটিশরা যখন মালয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তখন তিনি এই কৌশলটি প্রথম প্রয়োগ করেন। ব্রিগসের এই পরিকল্পনা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে অতি প্রিয় একটি কৌশল হিসেবে প্রতিভাত হয়। তারা নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও তেলেঙ্গানায় এই কৌশল প্রয়োগ করে। ছত্তিশগড়ের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং ঘোষণা দেন যে, তার সরকার মনে করে যে সব আদিবাসী তাদের গ্রাম ছেড়ে ক্যাম্পে এসে বসবাস শুরু না করেছে তারা সবাই মাওবাদী। সুতরাং বাস্তার

অঞ্চলে অতি সাধারণ একজন গ্রামবাসীও যে কিনা নিজের গ্রামে অবস্থান করছে এবং অতি সাদামাটা একটি জীবনযাপন করছে তার জীবনাচরণও ভয়ংকর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের শামিল।

বিশেষ সৌজন্যবশত একটি স্টিলের মগে করে লাল চা এবং একজোড়া এয়ারফোন কে যেন আমাকে দিল। সঙ্গে ছোট্ট একটি এমপি থ্রি প্লেয়ার। রেকর্ডিংটা খুব ভালো না হলেও বোঝা যায় কণ্ঠস্বরটি মিস্টার ডিএস মনোহরের। তিনি তখন বিজাপুরের পুলিশ সুপার। ওয়ারলেসে তিনি তার অধীনস্থ এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে 'জাগৃত' (সচেতন গ্রাম) গ্রামগুলোর জন্য এবং যে সব মানুষ গ্রাম ছেড়ে সালোয়া যুদুম ক্যাম্পে গিয়ে বসবাস করতে রাজি তাদের জন্যে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কী কী ধরনের সুযোগ- সুবিধার ব্যবস্থা রেখেছে সে সম্পর্কে কথা বলছিলেন। এর পরই তিনি পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দেন যে, যেসব গ্রামের মানুষ কথা না শুনবে সেসব গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে হবে এবং যেসব সাংবাদিক নকশালদের খবরাখবর সংগ্রহ করতে আসবে তাদেরকে দেখামাত্র গুলি করা হবে। (পত্রিকায় অনেক আগেই আমি এ সংবাদটি পড়েছিলাম। খবরটি প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে গেলে শাস্তিস্বরূপ সেই এসপিকে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে বদলি করে দেওয়া হয়। অবশ্য বোঝা গেল না শাস্তিটি আসলে কাকে দেওয়া হলো)। সালোয়া যুদুম অভিযানে প্রথম (২০০৫ সালের ১৮ জুন) যে গ্রামটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটির নাম আম্বেলি। ২০০৫ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে এই সালওয়া যুদুম চলাকালে দক্ষিণ দান্তেওয়ারার শত শত গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। চলে হত্যা, ধর্ষণ এবং লুটপাটের ঘটনা। বর্বর এই হামলার মূল কেন্দ্র ছিল বিজাপুর ও ভৈরমগড় জেলা। এগুলো বাইলাদিলার কাছাকাছি অঞ্চল, যেটি ঈশ্বর স্টিলের নতুন কারখানার প্রস্তাবিত স্থান। কাকতালীয় না হলেও এই অঞ্চলগুলোতেই রয়েছে মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি। এখানকার জনাতন সরকারগুলো বহু উন্নয়নমূলক কাজ সেখানে করেছে বিশেষত জল সেচের মাধ্যমে চাষাবাদের একটি কাঠামো তারা এসব অঞ্চলে গড়ে তুলেছে। এ কারণেই জনাতন সরকারগুলোই সালওয়া যুদুমের বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। শত শত মানুষকে এখানে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। প্রায় ষাট হাজার মানুষ তাদের বসতভিটা ছেড়ে ক্যাম্পে গিয়ে বসবাস শুরু করে। এদের মধ্যে কিছু গেছে স্বেচ্ছায় আর বাদবাকিরা ভয়ের কারণে। এদের মধ্য থেকে তিন হাজারকে বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা (এসপিও) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় মাসিক পনেরশ' রুপি বেতনে।

সামান্য এই রুটি- রুজির জন্যে নিলেশের ভাইয়ের মতো তরুণেরা নিজেদের কাঁটাতারের এক ক্ষুদ্র ও গন্ডির মধ্যে আজীবনের জন্যে আটকে ফেলেছে। যে নিষ্ঠুরতা তারা প্রদর্শন করেছে তাতে মনে হয় ভয়ংকর এই যুদ্ধের ভয়াবহতম শিকারে পরিণত হয়েই একদিন তারা তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। সুপ্রিমকোর্টের কোনো নির্দেশ যদি সালওয়া যুদুমের কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধও ঘোষণা করে তাতেও তাদের ভাগ্যের কোনো হেরফের হবে না।

বাকি হাজার হাজার মানুষ সরকারের দৃষ্টিসীমার বাইরেই চলে গেল। (তবে এই ৬৪৪টি গ্রামের জন্যে যে উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল তা কিন্তু তাদের সঙ্গে যায়নি। তাহলে এই স্বর্ণ খনি কাদের হস্তগত হয়েছিল?) এদের অনেকেই অন্ধ্র প্রদেশ এবং উড়িষ্যায় ঠিকা শ্রমিকের কাজ নিয়ে চলে গিয়েছিল যেমনটা তারা সাধারণত শীতের শুরুতে যায়। তবে লাখ লাখ মানুষ পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। এখনো তারা সেখানেই রয়ে গেছে, আশ্রয়হীন অবস্থায়। কেবল দিনের বেলায় সুযোগ বুঝে তারা তাদের ক্ষেতখামার বা বাড়িঘর ঘুরে যায়।

সালওয়া যুদুমের ক্ষতচিহ্ন হিসেবে অনেকগুলো থানা এবং ক্যাম্প জন্ম নিয়েছে। লক্ষ্য ছিল মাওবাদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অঞ্চলগুলো পুনর্দখলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা। ধারণা করা হয়েছিল যে,

অতিমাত্রায় শক্তিশালী নিরাপত্তা স্থাপনাগুলোতে আক্রমণ চালানোর সাহস হয়তো মাওবাদীরা পাবে না। অন্যদিকে মাওবাদীরাও ভাবল সরকারি এই শক্তিশালী নিরাপত্তা বলয়গুলো যদি তারা ভাঙতে না পারে তবে তা যে লোকগুলো তাদের ওপর আস্থা রেখেছে এবং যাদের সঙ্গে নিয়ে গত বিশ- পঁচিশ বছর ধরে তারা তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে সে মানুষগুলোকে পরিত্যাগ করারই শামিল বলে গণ্য হতে পারে। তাই তারা এ নিরাপত্তা বেষ্টনীর কেন্দ্রে দফায় দফায় আক্রমণ চালায়।

২০০৬ সালের ২৬ জানুয়ারি জনমুক্তি গেরিলা বাহিনীর (পিএলজিএ) সদস্যরা গাঙ্গালায় পুলিশ ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে সাতজনকে হত্যা করে। ২০০৬ সালের ১৭ জুলাই এরাবরে অবস্থিত সালওয়া যুদুম ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে ২০ জনকে হত্যা এবং ১৫০ জনকে আহত করে। (আপনারা হয়তো খবরটিকে এভাবেই পড়ে থাকতে পারেন : 'নকশালদের অত্যাচারের ভয়ে যে সব গ্রামবাসী পালিয়ে গিয়েছিল তাদের আশ্রয় দেওয়ায় জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্মিত শিবিরে মাওবাদীরা হামলা চালিয়েছে।') ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারা বাসাগুদা ত্রাণ শিবিরে হামলা চালিয়ে ৩ জন বিশেষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা (এসপিও) এবং একজন কনস্টেবলকে হত্যা করে। তবে ২০০৭ সালের ১৫ মার্চ তারিখে চালায় তারা তাদের সবচেয়ে দুঃসাহসিক অভিযানটি। জনমুক্তি গেরিলা বাহিনীর ১২০ জন গেরিলা রানী বদিলি কন্যা আশ্রমে আক্রমণ চালায়। এটি ছিল মেয়েদের একটি হোস্টেল যেটিকে ব্যারাক বানিয়ে ছত্তিশগড় পুলিশের (এবং বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা) ৮০ জন সদস্য সেখানে অবস্থান করছিল। আর সেখানকার মেয়েদেরকে তারা ব্যবহার করছিল মানবঢাল হিসেবে। জনমুক্তি গেরিলারা আশ্রম চত্বরে প্রবেশ করে মেয়েরা যে অংশটাতে অবস্থান করছিল সেই অংশটিকে পুরোপুরি ঘিরে রেখে ব্যারাক অংশে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৫৫ জন পুলিশ সদস্য এবং বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়। তবে কোনো একটি মেয়ের গায়েও কোনো রকম লাগেনি। (দান্তেওয়ারার অকপট স্বভাবের এসপি সেই ঘটনার ভয়াবহ কিছু ফটোগ্রাফ আমাকে দেখিয়েছিলেন। বোমার আঘাতে উড়ে যাওয়া সেই স্কুল বিল্ডিংয়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পুলিশদের পুড়ে যাওয়া ছিন্নভিন্ন দেহগুলো পড়ে ছিল। ছবিগুলো এতটাই বীভৎস ছিল যে, এগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে নিয়ে উপায় নেই। তিনি আমার প্রতিক্রিয়া দেখে খুশিই হয়েছিলেন বলে মনে হয়েছে।)

রানী বদিলির আক্রমণ দেশজুড়ে হইচই ফেলে দেয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলো কেবল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডই নয় তাদের শিক্ষাবিরোধী মনোভাব এবং স্কুলে আক্রমণ চালানোর ঘটনার জন্যও মাওবাদীদের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করতে থাকে। কিন্তু দন্ডকারণ্যে রানী বদিলি আক্রমণ একটি কিংবদন্তীর রূপ নেয় এবং এটিকে নিয়ে কবিতা- নাটকও লেখা হয়।

মাওবাদীদের প্রত্যাঘাত সরকারি বাহিনীর নিরাপত্তা বলয় ভেঙে দেয় এবং জনগণও নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। পুলিশ এবং সালওয়া যুদুমের লোকজন ক্যাম্পে ফিরে যায়। সেখান থেকে এখন তারা সাধারণত শেষ রাতের দিকে ৩০০ বা ১০০০ জন দলবদ্ধভাবে এসে গ্রামগুলোকে ঘিরে ফেলে এবং তল্লাশি চালায়। বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবার ছাড়া সালওয়া যুদুমে অংশগ্রহণকারী অন্য সবাই ক্যাম্প ছেড়ে ধীরে ধীরে গ্রামে ফিরতে শুরু করেছে। মাওবাদীরা তাদের স্বাগত জানিয়ে ঘোষণা দেয় যে, বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তারাও যদি তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকৃত অর্থেই অনুশোচনা করে এবং প্রকাশ্যে তা স্বীকার করে তবে তারাও গ্রামে ফিরে আসতে পারে। তরুণরা পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মিতে যোগ দিতে শুরু করল। (পিএলজিএ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ২০০০ সালের ডিসেম্বরে। গত ত্রিশ বছর ধরে এটির সশস্ত্র স্কোয়াডগুলো ধীরে ধীরে সেকশনে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। পরে তা সেকশন থেকে প্লাটুন এবং প্লাটুন থেকে কোম্পানিতে পরিণত হয়। তবে সালওয়াযুদুম নির্যাতনের পর পিএলজিএ দ্রুতই তাদের ব্যাটালিয়নের সামর্থ্য ঘোষণা করে)।

সালওয়া যুদুম শুধু ব্যর্থই হয়নি, উদগাতাদের জন্য এটা ছিল ভয়াবহ রকমের আত্মঘাতী। বর্তমানে এর যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যায়, এটি স্বল্পমেয়াদি এবং স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সংবাদ মাধ্যমে একে নিয়ে যত ধরনের কথাই বলা হোক না কেন সালওয়া যুদুম ছিল আসলে ছত্তিশগড় সরকার ও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের পরিকল্পিত যৌথ অভিযান। এটি ব্যর্থ হোক তা তারা কোনোভাবেই চায়নি। এমনকি তাদের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকগুলো যখন বিয়ের বাজারে বিগত যৌবন নরনারীর আশাবাদ নিয়ে বসে থাকার দশা তখনও না। সরকারের ওপর প্রচন্ড চাপ ছিল নতুন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। ফলে অপারেশন গ্রিন হান্ট নামের নতুন পরিকল্পনা নিয়ে সরকার এগিয়ে এলো। সালওয়া যুদুমের সময়কার বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তাদের নতুন নাম দেওয়া হল কয়া কমান্ডো। পরিকল্পনায় ছত্তিশগড়ের সশস্ত্র বাহিনীকে (সিএফ) সংযুক্ত করা হল। সংযুক্ত করা হল কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ), সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ), ভারত- তিববত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি), কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ), গ্রে হাউন্ডস, স্করপিও এবং কোবরা বাহিনীকে। নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হল আপাত সংবেদনশীল নামের ডব্লিউএইচএএম বা উইনিং হার্টস অ্যান্ড মাইন্ডসকে (হৃদয়মন জয়করণনীতি)।

গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সময় সময় বেঠিক জায়গায়ও সংঘটিত হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতি সোভিয়েত সাম্যবাদকে পরাজিত করেছিল আফগানিস্তানের ঊষর পার্বত্য ভূমিতে। আর দান্তেওয়ারার এই জঙ্গলের যুদ্ধ ক্রোধোন্মত্ততা ছড়াচ্ছে ভারতবর্ষের আত্মাকে রক্ষা করবে বলে। বিস্তর বলা হয়েছে, ভারতীয় গণতন্ত্রের ঘণায়মান সংকট নিয়ে। আলোচনা হয়েছে অনেক এখানকার বড় বড় বেনিয়া গোষ্ঠী, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল এবং নিরাপত্তা স্থাপনাসমূহের মধ্যকার যোগসাজশের বিষয়টি নিয়ে। কেউ যদি এ সম্পর্কে ত্বরিত কোন অনুসন্ধান চালাতে চান, তাকে বলব দান্তেওয়ারায় আসুন।

রাজ্য সরকারের কৃষি সম্পর্ক এবং অসমাপ্ত ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত খসড়া প্রতিবেদন (ভলিউম- ১) থেকে জানা যায় যে, সালওয়া যুদুম অভিযানের প্রথম অর্থ জোগানদাতা ছিল টাটা স্টিল এবং ঈশ্বর স্টিল। এটি যেহেতু ছিল একটি সরকারি প্রতিবেদন সেহেতু সংবাদ মাধ্যমে এটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে হৈচৈ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। (তবে চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে সেই অংশটি পরে বাদ দেওয়া হয়। সত্যি সত্যি কি এটি ছিল কোনো ধরনের ভুল নাকি বড় কোনো চাপের মুখে এ কাজটি করা হয়েছে?) ২০০৯ সালের ১২ অক্টোবর লোহান্দিগুদায় টাটার ইস্পাত কারখানার ওপর বাধ্যতামূলক এক গণশুনানি হওয়ার কথা ছিল। স্থানটিও স্থানীয় জনসাধারণের জন্যে সহজগম্য ছিল। কিন্তু সেটি সেখানে না হয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বহু মাইল দূরের জগদলপুরে অবস্থিত কালেক্টরেট অফিসের ছোট্ট একটি কামরায়। ব্যাপক পুলিশ বেষ্টনীরও ব্যবস্থা করা হয় সেখানে। আর পুলিশ প্রহরায় সরকারি জিপে করে হাজির করা হয় জনাপঞ্চাশেক ভাড়া করা আদিবাসীকে লোক দেখানো জনতা হিসেবে। সভা শেষে জেলা কালেক্টর লোহান্দিগুদার আধিবাসীদেরকে তাদের সহযোগিতার জন্য অভিনন্দন জানান। স্থানীয় পত্রিকাগুলো এই মিথ্যাচারকেই সংবাদ হিসেবে প্রচার করে। যদিও তারা এই মিথ্যাচার সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল ছিল। (টাটার বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে পত্রিকাগুলো সয়লাব হয়ে যেতে লাগল)। গ্রামবাসীদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রকল্পের জন্যে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়ে গেল।

মাওবাদীরাই একমাত্র শক্তি নয় যারা ভারত রাষ্ট্রকে উৎখাত করতে চায়। ইতিমধ্যেই এটি একাধিকবার উৎখাত হয়েছে। কখনো হিন্দু মৌলবাদ দ্বারা, কখনো আবার অর্থনৈতিক আধিপত্যকামিতা দ্বারা। দান্তেওয়ারা থেকে গাড়ি চালিয়ে ঘণ্টা পাঁচেক লাগে লোহান্দিগুদা পৌঁছতে। এলাকাটি আগে কখনোই নকশাল প্রভাবিত ছিল না। কিন্তু এখন নকশালরা সেখানে আছে। পিঁপড়ার চাটনি খাওয়ার সময় আমার পাশে বসে থাকা কমরেড জুরি এই এলাকায়ই কাজ করে। সে আমাকে জানিয়েছে, তারা যখন গ্রামের

www.freebanglabooks.com

ঘরবাড়িগুলোর বেড়া বা দেয়ালে 'নকশালি আও, হামে বাঁচাও' (নকশালরা এস এবং আমাদের বাঁচাও!) জাতীয় লেখা দেখতে পেল তখনই তারা ওই অঞ্চলে যাতায়াত আরম্ভ করে দিল। মাস কয়েক আগে গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি বিমল মেশরাম স্থানীয় বাজারের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। সে ছিল টাটাদের লোক। জুরি আরো জানাল, বিমল গ্রামের লোকজনকে তাদের জমিজমা ছেড়ে দিয়ে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্যে চাপ দিচ্ছিল। ভালোই হল যে তাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আমরাও অবশ্য আমাদের একজন কমরেডকে হারিয়েছি। তারা তাকে গুলি করে হত্যা করেছে।

আপনাকে কি আরেকটু চাপুলি দিব? তার বয়স মাত্র কুড়ি। সে বলতে লাগল 'আমরা টাটাকে এখানে আসতে দেব না। মানুষ তাদেরকে চায় না।' জুরি অবশ্য পিএলজিএ নয়। সে পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন চেতনা নাট্যমঞ্চের (সিএনএস) সঙ্গে জড়িত। সে গান লেখে। তার বাড়ি আভুজমাদ। (কমরেড মাধবের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। মাধব যখন সিএনএসের একটি দল নিয়ে জুরিদের গ্রামে এসেছিল তখন মাধবের গান শুনে সে তার প্রেমে পড়ে যায়)। কথাবার্তায় এই পর্যায়ে আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। মনে হচ্ছিল আমি তাকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অসাড়তার কথা বলি, বোঝাই যে যখন তখন এসব খুন খারাবির ঘটনা মানুষ গ্রহণ করে না। কিন্তু এগুলোর পরিবর্তে আমি তাদের কি করার পরামর্শ দেব? অধিকার রক্ষায় আদালতের দ্বারস্থ হতে বলব? নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে ধরনা দিতে বলব? মিছিল সমাবেশ? লাগাতার অনশন? এ জাতীয় ব্যাপার- স্যাপার আমার কাছে হাস্যকরই মনে হয়। বরং নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতির ধ্বজাধারীদের কাছেই জানতে চাওয়া উচিত প্রতিরোধের বিকল্প পন্থাটা কি? তারা তো আবার খুব সহজেই বলে বসেন, না না, নয়া উদারবাদী এই অর্থনৈতিক নীতির কোনো বিকল্পই নেই। তবে অরণ্যের এই মানুষগুলোর সামনে কি বিকল্প আছে তা খুব সুনির্দিষ্টভাবেই তাদেরকে জানাতে হবে। আর সেটি এ মুহূর্তেই এবং এখানেই। কোন দলকে তারা ভোট দেবে এই দেশে এমন কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আছে যার বা যাদের কাছে তারা যেতে পারে?

নর্মদা নদীর বড় বড় বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর আন্দোলন- সংগ্রাম করতে গিয়ে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন করে দরজায় দরজায় ধরনা দেয়া হয়েছে। আসলে সবই দেখছি অন্ধকার। ক্যাম্পে বহু ধরনের কর্মকান্ডই চলছে। কিন্তু আমার চোখে কিছুই ধরা পড়ছে না কেবল সামান্য একটু আলোকরশ্মি ছাড়া। তবে বলা কঠিন সেটি কার আলো- তারার, জোনাকির, নাকি মাওবাদীদের অগ্রযাত্রার।

ছোট্ট এই মাংতু কোত্থেকে এসেছে আমি জানি না। তবে এটুকু জেনেছি যে, সে ১০ জন কিশোরীকে নিয়ে গঠিত তরুণ কমিউনিস্টদের চলমান বিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের একজন ছাত্র। তাদেরকে সেখানে পড়তে ও লিখতে শেখানো হয় এবং কমিউনিস্ট আদর্শের মৌলিক নীতিগুলো সম্পর্কে দীক্ষা দেওয়া হয়। (আমাদের বেনিয়া প্রচার মাধ্যম বিষয়টিকে শিশুদের মতাদর্শিক দীক্ষা আখ্যা দিয়ে রাতদিন চেঁচামেচি করছে। তবে টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলো কোনো কিছু নিয়ে ভাবতে শেখার আগেই আমাদের শিশুদের মগজ ধোলাই করছে সেটাকে কিন্তু কোনো ধরনের ভাবাদর্শিক দীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না।) কিশোর কমিউনিস্টদের অস্ত্র বহন করার কিংবা ইউনিফর্ম পরার নিয়ম নেই। তবে রক ব্যান্ডের সদস্যদের মতো এরা পিএলজিএ- এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। চোখে- মুখে তাদের তারকার দ্যুতি।

মাংতুর ওপর ইতিমধ্যেই আমার এক ধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি হয়ে গেছে। আমার পানির বোতলটা ভরে দিয়েই সে বলল, আমি এখন আমার ব্যাগ গোছাব। একটি বাঁশি বেজে উঠল। নীল রঙের ঝিল্লির তাঁবুটি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই খুলে ভাঁজ করে ফেলা হল। আর একবার বাঁশি বাজতেই একশ' কমরেডের সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। মোট পাঁচটি সারি। কমরেড রাজু হচ্ছে অভিযানের

www.freebanglabooks.com

পরিচালক। এর পর শুরু হল নাম ডাকা। আমিও একটি সারিতে দাঁড়ানো। চিৎকার করে আমার ধারাক্রম নম্বরটি বলছিলাম। এ সময় আমার সামনে দাঁড়ানো কমরেড কমলাও আমাকে আমার সংখ্যাটি বলার জন্য তাড়া দিচ্ছিল। (আমরা কুড়ি পর্যন্ত গোনা হলেই আবার এক থেকে শুরু করছিলাম। গন্ডদের মধ্যে কোনো কিছু গণনা করার রীতিটি এমনই। কুড়ি সংখ্যাটিকে পয়া হিসেবে বিবেচনা করে। আমাদের জন্যেও হয়তো বা কুড়ি সংখ্যাটি তেমনই কিছু হবে।) চান্দুকে এখন খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তার কাঁধে একটি স্টেনগান। একটু নিচু স্বরেই কমরেড রাজু দলের লোকজনকে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সবকিছুই বলছিল গন্ডু ভাষাতে।

সবকিছুই চলছিল গন্ডু ভাষাতে। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি। তবে খেয়াল করছিলাম 'আরভি' বলে একটি শব্দ তারা বার বার উচ্চারণ করছিল। পরে রাজু আমাকে জানায়, মূল শব্দটি 'রভিভুজ'। এটি একটি গন্ডি শব্দ যার অর্থ পূর্বনির্ধারিত স্থানে মিলিত বা সমাবিষ্ট হওয়া। প্রতিপক্ষের গোলাগুলির মুখে পড়ে লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সে অবস্থায় তারা পরে আবার কোথায় মিলিত হবে তেমন নির্দেশনা দিতে গিয়েই আমরা আরভি শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। তার এ ধরনের কথাবার্তা আমার মনে কী ধরনের আতঙ্কের জন্ম দিচ্ছে সে সম্ভবত ঠিকমতো তা বুঝে উঠতে পারছিল না। আমার আতঙ্কিত হওয়ার কারণ এই ছিল না যে, আমি গোলাগুলির মধ্যে পড়তে পারি। আমি বরং এই ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম, সেরকম পরিস্থিতিতে আমি হয়তোবা হারিয়ে যেতে পারি। আমি একজন দিককানা মানুষ। নিজের শোবার ঘর থেকে গোসলখানা কিংবা গোসলখানা থেকে শোবার ঘরে আসা-যাওয়ার পথেই আমি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ি। ৬০ হাজার বর্গকিলোমিটারের এই অরণ্যে তাহলে আমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? তবে আপদবিপদ যাই আসুক কমরেড রাজুই আমার ভরসা।

আমরা রওনা দেওয়ার আগে কমরেড বেনু বললো, 'ঠিক আছে কমরেড, আমি তাহলে বিদায় নিচ্ছি।' একটু ভড়কে গেলাম। মাথার পশমি টুপি আর পায়ে চপ্পল পরা অবস্থায় তাকে ক্ষুদ্রাকৃতির একটি মশকের মতই দেখাচ্ছিল। ভারি অস্ত্র হাতে তিনজন নারী ও তিনজন পুরুষ রক্ষী তাকে ঘিরে রেখেছিল। 'এতটা পথ পার হয়ে আপনি এখানে এসেছেন, সে জন্য আমরা আপনার প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ কমরেড'- বলেই আরো একবার করমর্দন এবং হাত মুষ্টিবদ্ধ করলো সে। এর পর 'লাল সালাম কমরেড' বলেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল গুরু দায়িত্ববহনকারী মুহূর্তের মানুষটি। মুহূর্তের মধ্যেই মনে হলো সে এখানে ছিল না, কখনোই না। একটু যেন নিঃসঙ্গই বোধ করছিলাম। কিন্তু আমার যে অনেক কাজ পড়ে আছে, মানুষের কথা শুনতে হবে, সেসব রেকর্ড করতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। দিন গিয়ে সপ্তাহ আসবে। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে দেখা হবে। কমরেড বেনুর কাছ থেকে শোনা কাহিনীগুলোতে অনেকেই আবার নতুন রংয়ের প্রলেপ দেবে। আমরা বিপরীতমুখী হাঁটতে শুরু করলাম। মাইলখানেক দূর থেকে পাওয়া আইওডিক্সের গন্ধের মতো কমরেড রাজু স্মিত হাস্যেই বলতে লাগলো, 'আমার হাঁট ুদুটি গেছে। মুঠোভর্তি বেদনানাশক না খেয়ে আমি হাঁটতেই পারি না।' কমরেড রাজু বিশুদ্ধ হিন্দিতে কথা বলে, আর নির্বিকারভাবে মজার মজার গল্প বলে যায়। রায়পুরে সে আঠারো বছর ধরে আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছে। সে এবং তার স্ত্রী মালতী দু'জনেই পার্টির কর্মী ছিল এবং শহর অঞ্চলে পার্টির কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল।

২০০৭ সালের শেষের দিকে পার্টির রায়পুর অঞ্চলের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী গ্রেফতার হয়ে যায়। তার ওপর নির্যাতন চালানো হয় এবং একপর্যায়ে সে পুলিশের গুপ্তচর হয়ে যায়। পুলিশের একটি বদ্ধগাড়িতে করে তাকে রায়পুর শহরে ঘোরানো হয় যাতে সে তার পুরনো সহকর্মীদের চিনিয়ে দিতে পারে। এমন সহকর্মীদের মধ্যে মালতীও একজন। ২০০৮ সালের ২২ জানুয়ারি আরো অনেকের সঙ্গে সে গ্রেফতার হয়। তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ সে সালওয়া যুদুমের নির্যাতনের ভিডিওচিত্র সংবলিত সিডি বিভিন্ন

সংসদ সদস্যের কাছে ডাকযোগে পাঠিয়েছে। তার মামলার কোনো রকম শুনানি হয় না বললেই চলে। কারণ পুলিশ জানে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন। কিন্তু নতুন যে ছত্তিশগড় বিশেষ জননিরাপত্তা আইন (সিএসপিএসএ) তৈরি করা হয়েছে তার আওতায় পুলিশ তাকে জামিন না দিয়ে বছরের পর বছর আটকে রাখতে পারে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, সরকার এখন ব্যাটালিয়নের পর ব্যাটালিয়ন ছত্তিশগড় পুলিশ নিয়োজিত করে বেচারা সংসদ সদস্যদের তাদের নিজস্ব ডাকগুলোর হাত থেকে রক্ষা করছে। কমরেড রাজু জানাল, সে তখন একটি মিটিংয়ে যোগ দিতে দন্ডকারণ্যে ছিল বলে গ্রেফতার হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে। তখন থেকে সে এখানেই রয়ে গেছে। তার স্কুলপড়ুয়া দুটি সন্তান, যারা একাকী বাড়িতে রয়ে গিয়েছিল, পুলিশ তাদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। শেষ পর্যন্ত সেই আবাস গুটিয়ে অন্যত্র বসবাসের জন্য তারা তাদের এক কাকার সঙ্গে চলে গেছে।

কয়া আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। ভূমকল মানে ভূমিকম্প। কমরেড রাজু জানাল, দিনের পর দিন হেঁটে মানুষ এসে উৎসবে যোগ দেবে। মানুষের পদভারে প্রকম্পিত হবে বনাঞ্চল। দন্ডকারণ্যের সর্বত্রই, সব বিভাগেই উৎসবের আমেজ বিরাজিত। আমরা ভাগ্যবান যে, উৎসব উদযাপনের কারিগর কমরেড লেংও আমাদের সঙ্গেই হাঁটছেন। গন্ডি ভাষায় লেং মানে 'কণ্ঠস্বর'। মাঝ বয়সী কমরেড লেং দীর্ঘদেহী। বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশে। কিংবদন্তি গায়ক কবি লোকনন্দিত গদারের তিনি এক সময়কার সহযোগী। গদার ১৯৭২ সালে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক সংগঠন জননাট্যমঞ্চ (জেএনএম) প্রতিষ্ঠা করেন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে জেএনএম পিডব্লিউজি'র অবিচ্ছেদ্য এক অংশে পরিণত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে লাখ লাখ মানুষ এ সংগঠনের অনুষ্ঠান দেখতে হাজির হতো। কমরেড লেং ১৯৭৭ সালে এতে যোগ দেন এবং নিজ গুণেই এক সময় খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হন। পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে মারা যাওয়া'র কাহিনীপূর্ণ সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশেই ছিলেন। সে সময় প্রতিদিনই তার কোনো না কোনো বন্ধু নিহত হচ্ছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাকেও একরাতে হাসপাতালের শয্যা থেকে তুলে নেওয়া হয়। ডাক্তারের ছদ্মবেশে পুলিশের এক মহিলা সুপারিনটেনডেন্ট তাকে তুলে নেয়। ওয়ারাঙ্গালের বাইরের এক জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে 'বন্দুকযুদ্ধে' হত্যা দেখানোর জন্য। তবে তিনি ভাগ্যবান। কমরেড লেং বললেন, গদারের কাছে এই সংবাদটি পৌঁছে যায় এবং তিনি ব্যাপারটি নিয়ে সোচ্চার হন।

পিডব্লিউজি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলে চেতনা নাট্য মঞ্চকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ১৯৯৮ সালে কমরেড লেংকে দন্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর পর থেকে তিনি এখানেই। এই তো তিনি আমাদের সঙ্গেই হাঁটছেন। গায়ে জলপাই সবুজ শার্ট। কী এক কারণে তার পায়জামাটা লাল। এর ওপর আবার গোলাপি রংয়ের ফোটা ফোটা দাগ। সিএনএমের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০ হাজার বলে জানিয়ে তিনি আমাকে বললেন, হিন্দি, গন্ডি, ছত্তিশগড়ি এবং হালবি মিলিয়ে আমাদের গানের সংখ্যা এখন ৫০০। ১৪০টি গানের একটি সংকলনও আমরা ছাপিয়ে বের করেছি।

চেতনা নাট্য মঞ্চের প্রত্যেকেই গান লেখে।

প্রথমবার যখন লেং- এর সঙ্গে আমার কথা হয় তাকে খুব রাশভারি এবং বেশ অকপট স্বভাবেরই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে একদিন আগুনের পাশে বসে, সেই পাজামা পরা অবস্থায় তিনি আমাকে তার এক বন্ধু, মূলধারার এক তেলেগু চলচ্চিত্রকারের সাফল্যের কাহিনী শোনান। সেই চলচ্চিত্রকার তার নিজের ছবিগুলোতে নকশালদের সব সময় একটু খাটোভাবে উপস্থাপন করে থাকেন। 'আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম', কমরেড লেং তার স্বভাবজাত তেলেগু উচ্চারণের হিন্দিতে বলতে লাগলেন, কেন তুমি ভাব যে নকশালরা সব সময়ই এরকম? বলেই তিনি একে- ৪৭ রাইফেল কাঁধে তাড়া খাওয়া, ভীতসন্ত্রস্ত

একজন মানুষের ত্রস্ত পায়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার দৃশ্য অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে অভিনয় করে দেখাতে লাগলেন। আমরা হাসি চাপতে পারলাম না।

আমি নিশ্চিত নই, আমি কোনো ভূমকল উৎসব উদ্যাপন দেখতে পাব কিনা। তবে মনে হচ্ছে, মাওবাদী প্রচারণার আদলে অনুষ্ঠিত প্রচলিত কোনো আদিবাসী নৃত্যই দেখতে পাব। যেখানে থাকবে উদ্দীপনাদায়ী বাগাড়ম্বরপূর্ণ সব বক্তৃতা আর জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকা সুবোধ কিছু দর্শকশ্রোতা। বেশ দেরি করেই সন্ধ্যার দিকে আমরা গিয়ে মাঠে পৌঁছি। ইতোমধ্যেই লাল কাপড়ে মোড়ানো বাঁশের তৈরি অস্থায়ী একটি স্মৃতিস্তম্ভ সেখানে স্থাপন করা হয়েছে। স্তম্ভের একেবারে চূড়ায় মাওবাদী পার্টির কাস্তে- হাতুড়ির ওপরে রয়েছে জনতা সরকারের প্রতীক রুপার পাতে মোড়ানো তীর- ধনুক। যথাযথ পদক্রমই বলতে হয়। মঞ্চটি বিশাল আকারের। তবে এটিও অস্থায়ী। শক্ত বাঁশের গায়ে ভারি কাদার প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। মাঠের চারদিকে এখানে- সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ইতোমধ্যেই ছোট ছোট আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। লোকজন আসতে শুরু করেছে, সন্ধ্যার খাবারও অনেকে রাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। অন্ধকারে তাদের কেবল ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে। আমরা তাদের মাঝখান দিয়েই হাঁটতে শুরু করলাম (লাল সালাম লাল সালাম লাল সালাম) এবং মিনিট পনেরো হেঁটে আবারো জঙ্গলে প্রবেশ করলাম।

নতুন ক্যাম্পেও আমাদের আবার সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হলো। আবারো সেই নামডাকা। বুঝিয়ে দেওয়া হলো কে কোথায় পাহারা দেবে। গুলির দূরত্বে কোন দিকে কতটা- পুলিশ আক্রমণ চালালে কে কোন জায়গা থেকে তা মোকাবিলা করবে। আর 'ভি' চিহ্ন অর্থাৎ পরে কোন কোন জায়গায় গিয়ে আবার সবাই মিলিত হবে সেসব স্থানও নতুন করে চিহ্নিত করা হলো। কিছু লোক একটু আগেভাগেই এসে গিয়েছিল এবং রাতের খাবারটাও তারা রান্না করে ফেলেছে। ডেজার্ট হিসেবে খাওয়ার জন্য কমলা আমাকে একটি জংলি পেয়ারা দিল। পথে আসার সময় গাছ থেকে সে এটা আমার জন্য ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে। ভোর হতেই দেখা গেল মানুষের ঢল। উদ্দেশ্য দিনটি উদ্যাপন। দেখতে দেখতে চারদিক সরগরম হয়ে উঠল। দীর্ঘদিন পর আবার অনেকের সঙ্গে অনেকের দেখা হচ্ছে। মাইক্রোফোনের শব্দ যাচাই শোনা যাচ্ছে। পতাকা, ব্যানার, পোস্টার, রঙিন কাপড়ের টুকরো সব উড়তে শুরু করেছে। পাঁচজন মানুষের ছবিসংবলিত একটি ব্যানার চোখে পড়ল। আমরা যেদিন এখানে এসে পৌঁছি সেদিনই এরা ওংনারে নিহত হয়।

আমি কমরেড নর্দমা, কমরেড ম্যাসে এবং কমরেড রুপির সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি। কমরেড নর্দমা গাদাচিরুলিতে বহু বছর কাজ করেছে। সেই অভিজ্ঞতাই সে বর্ণনা করছিল। সেখান থেকেই সে ক্রান্তিকরি আদিবাসী মহিলা সংগঠন (কেএমএস)- এর দন্ডকারণ্য অঞ্চলের প্রধান হয়ে চলে আসে। রুপি আর ম্যাসে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের শহরাঞ্চলে নিয়োজিত পার্টি কর্মী। তারা আমাকে জানাল বছরের পর বছর পার্টির অভ্যন্তরেই নারীদের কীভাবে লড়াই করতে হয়েছে। এটি শুধু নারী হিসেবে নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারই ছিল না, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখতে গেলে নারী- পুরুষের সমতা যে কতটা জরুরি সেটিই তারা পার্টিকে দেখিয়ে দিতে চেয়েছে। আমরা সেই সত্তরের দশক নিয়ে কথা বললাম। আন্দোলনের সে সময়গুলোতে পার্টির মহিলা কমরেডরা কীভাবে এবং কেন পুরুষ কমরেডদের ব্যাপারে নির্মোহ হয়ে পড়েছিল। এ পুরুষ কমরেডরা নিজেদের নিজেরা মহাবিপ্লবী মনে করলেও তারা আসলে পুরনো সেই পুরুষতান্ত্রিকতা দ্বারাই আচ্ছন্ন ছিল, সেই পুরনো উৎকট স্বাদেশিকতা। ম্যাসে জানাল, অবস্থা এখন অনেকটাই পাল্টেছে। তবে আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে তাদের (পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিট ব্যুরোতে এখনো কোনো মহিলা সদস্য নেই)।

দুপুর নাগাদ পিএলজিএ- এর আরো একটি দল এসে হাজির। দলটির নেতৃত্বে ছিল দীর্ঘকায় শান্ত প্রকৃতির একজন লোক। চোখেমুখে তার বালকসুলভ আভা। এ কমরেডের দুটি নাম। একটি সুখদেব এবং অপরটি গুদসা উসেন্ডি। তবে কোনোটিই তার আসল নাম নয়। সুখদেব নামে অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন কমরেড ছিলেন যিনি শহীদ হয়ে গেছেন (এই যুদ্ধে কেবল মৃত ব্যক্তিরাই আসল নামে পরিচিত হতে পারে। জীবিতদের জন্য আসল নাম ব্যবহার করা মোটেই নিরাপদ নয়)। এই যেমন গুদসা উসেন্ডি নামটির কথাই ধরা যাক। বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময়ে এ গুদসা উসেন্ডি নামে পরিচিত হয়েছে (মাসকয়েক আগে কমরেড রাজুই এ নামে পরিচিত ছিল)। গুদসা উসেন্ডি নামটি দন্ডকারণ্যে পার্টির মুখপাত্র হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং দন্ডকারণ্যে অবস্থানের বাকি সবটা সময়ই সুখদেব সঙ্গে থাকলেও আবার কীভাবে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। যদিও যে কোনো জায়গায়ই হোক তার হাসিটা আমি চিনতে পারব। সে জানাল, '৮৮ সালে সে এই দন্ডকারণ্যে এসেছে। ওই সময় পিডব্লিউজি তার এক- তৃতীয়াংশ যোদ্ধাকে উত্তর তেলেঙ্গানা থেকে দন্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সিভিল পোশাক পরা অবস্থায় বেশ ভালোই লাগছিল সুখদেবকে (গন্ডিরা সিভিল পোশাকই পরে থাকে)। এটি 'ড্রেস' (মাওবাদীদের ইউনিফর্ম) এর ঠিক বিপরীত। সে নিজেকে একজন তরুণ নির্বাহীর মতোই উপস্থাপন করছিল। আমি জানতে চাইলাম, তার গায়ে ইউনিফর্ম নেই কেন। সে জানাল, অনেকটা পথ হেঁটে এই মাত্র সে কেশখাল ঘাট থেকে ফিরে এসেছে। স্থানটি কানকারের কাছাকাছি। জানা গেছে, সেখানে ৩০ লাখ টন বকসাইটার মজুদ রয়েছে এবং বেদান্ত নামক একটি কোম্পানির এর ওপর নজর পড়েছে।

বিঙ্গো। যা বলেছে ব্যাপারটা বোঝার জন্য তাই যথেষ্ট। সুখদেব বলল, সে গিয়েছিল সেখানকার মানুষদের মনোভাব জানার জন্য তারা এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত কিনা। তারা এখন একটা স্কোয়াড পাঠাতে বলেছে। সেইসঙ্গে বন্দুকও চায় তারা। মাথাটা পেছন দিকে এলিয়ে দিয়ে সে হাসতে লাগল। আমি তাদের বলেছি ব্যাপারটা খুব সহজ নয় ভাই। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং যতটা অবলীলায় সে তার একে- ৪৭টি বহন করছিল তা থেকে বোঝা যায়, পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মির (পিএলজিএ) সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং এর ওপর তার একটা কর্তৃত্বও রয়েছে।

জঙ্গলের ডাক এল। এতে আমার জন্য একটি বিস্কুট ছিল। পাঠিয়েছে কমরেড বেনু। কয়েক ভাজ করা ছোট্ট কাগজটিতে একটি গানের কথাগুলো লেখা ছিল। সে আমাকে কথা দিয়েছিল, এটি আমার জন্য পাঠাবে। গানের কথাগুলো পড়তে গিয়ে কমরেড নর্মদা মৃদু মৃদু হাসছিল। গানে বর্ণিত ঘটনাটি তার জানা। এটি সেই আশির দশকের কথা। জনগণ তখন পার্টির ওপর বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছে এবং নিজেদের মধ্যকার বিরোধগুলো সমাধানের জন্য পার্টির কাছে আসছে। কথাগুলো কমরেড বেনুর কাছ থেকেই শোনা। প্রথম দিকে মহিলারাই বেশি করে আসতে শুরু করে। এক সন্ধ্যায় আগুনের পাশে বসে থাকা এক বৃদ্ধা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বয়স্কদের উদ্দেশ করে একটি গান গাইতে শুরু করে। সে ছিল একজন মাদ্দিয়া নারী। তাদের সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিয়ের পর একজন নারীকে তার বুকের অন্তর্বাসটি খুলে ফেলতে হয় এবং তখন থেকেই তাকে উদোম বুকে থাকতে শুরু করতে হয়।

'জাম্পার পোলো ইন্তোর দাদা, দেকুনিলে তানে তাসুম ইন্তোর দাদা, দেকুনিলে ব্যাটা পাপাস কিতম দাদা, দেকুনিলে দুনিয়া কাদিলে ম্যাতা দাদা' দেকুনিলে তারা বলছে গায়ে আমরা ব্লাউজ রাখতে পারব না, দাদা দেকুনিলে তারা আমাদের এগুলো খুলতে বাধ্য করছে দাদা, এভাবেই আমরা অভিশপ্ত হয়েছি দাদা, দুনিয়া পাল্টে গেলেও এগুলো পাল্টায়নি দাদা। আতুম হাটেকে দাদা, দেকুনিলে আদা নাঙ্গা দান্তম দাদা,

দেকুনিলে ইদ পিজভল মান্নি দাদা, দেকুনিলে মাভা কয়াতুরকু বেহাত দাদা, দেকুনিলে আমরা যখন বাজারে যাই দাদা অর্ধনগ্ন অবস্থায়ই যেতে হয় দাদা, এমন জীবন আমরা চাই না দাদা, আমাদের আগের যারা ছিল তারা তাই বলত। এটিই ছিল নারী নির্যাতনমূলক প্রথম ইস্যু যার বিরুদ্ধে পার্টি লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়। খুব সাবধানেই কাজটি করতে হবে। অনেকটা শল্যবিদের অস্ত্রোপচারের কাঁচি দিয়ে কাটাছেঁড়ার মতো করে। ১৯৮৬ সালে পার্টি আদিবাসী মহিলা সংগঠন (এএমএম) গঠন করে। পরবর্তী সময়ে এটিই ক্রান্তিকারি আদিবাসী মহিলা সংগঠন (কেএএমএম) রূপে আবির্ভূত হয়। বর্তমানে এর নিবন্ধিত সদস্য সংখ্যা ৯০ হাজার। বলা যায়, এটিই দেশের সবচেয়ে বড় নারী সংগঠন।

(এরা সবাই মাওবাদী, ৯০ হাজারের সবাই। এরাও কি শেষ হয়ে যাবে? তা ছাড়া সিএনএমের যে ১০ হাজার সদস্য রয়েছে তাদের ভাগ্যেই বা কী ঘটবে? তারাও কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?) কেএএমএস জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ার প্রথা এবং নারী অপহরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। তারা আন্দোলন করছে রজঃদর্শনকালে একটি মেয়েকে জোর করে গ্রামের বাইরে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে একটি কুঁড়েঘরে বাস করতে বাধ্য করার রীতির বিরুদ্ধে। প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় পুরুষের দ্বিতীয় বিয়ের বিরুদ্ধে এবং নানা ধরনের পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে। এরা এখনো সংগ্রামের সব ক্ষেত্রে জয়ী হতে পারেনি। তবে কোন নারীবাদীই বা তা পেরেছে? যেমন দন্ডকারণ্যের মেয়েরা এখনো পর্যন্ত জমিতে বীজ বপন করার অধিকার পায়নি। পার্টির মিটিংয়ে পুরুষরা স্বীকার করে, এটি অন্যায় এবং এখন থেকে আর এমনটা হবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে তারা এটা মেনে নেয় না। এরপরই পার্টি সিদ্ধান্ত নেয়, মেয়েরা সাধারণ ভূমিতে অর্থাৎ জনাতন সরকারের মালিকানাধীন জমিতে বীজ বপন করতে পারবে। এর পর থেকে মেয়েরা সেসব জমিতে বীজ বপন করতে শুরু করে, সবজি ফলাতে শুরু করে এবং ক্ষেতের আলও তৈরি করতে থাকে। এটিকে অর্ধবিজয় বলা যায়, পুরোপুরি নয়। বাস্তারে পুলিশি নির্যাতন বেড়ে গেলে কেএএমএসের নারীরা তা মোকাবিলায় প্রবল শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে। শত শত এমনকি হাজার হাজার নারী পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সত্যি বলতে কি, কেএএমএসের অস্তিত্বই মানুষের পুরনো বা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পাল্টে ফেলে। নারীর প্রতি এতদিনকার আচরিত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এ কারণেই বহু অল্প বয়স্ক মেয়ে পার্টিতে যোগদানের মাধ্যমে বিশেষত পিএলজিএতে যোগ দিয়ে নিজ সমাজের দমবন্ধকর অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার দিশা খুঁজে পায়। সালওয়াজুদুম চলাকালে কেএএমএসের মহিলা কর্মীদের উপর কি ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হতো তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন কেএএমএসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কমরেড সুশীলা। তিনি জানান, তাদের সে সময়কার একটি স্লোগান ছিল হাম দু বিবি লেয়েঙ্গে! লেয়েঙ্গে! (আমাদের দুটি করে স্ত্রী থাকবে। অবশ্যই দুটি করে!) ধর্ষণের অসংখ্য ঘটনা তো ঘটেছেই, সেইসঙ্গে কেএএমএসের সদস্যদের ওপর পাশবিক পদ্ধতিতে যৌন নির্যাতন চালিয়ে তাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত করা হতো। কম বয়সের বহু মেয়ে এ বর্বরতা দেখার পর পিএলজিএতে যোগ দেয়। পিএলজিএ- এর কর্মীবাহিনীর ৪৫ শতাংশই এখন মহিলা। কমরেড নর্মদা তাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই তারা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল।

কমরেড রিংকি। মাথার চুলগুলো খুব ছোট করে ছাঁটা। গন্ডি ভাষায় এটাকে তারা ববকাটই বলে। তবে মেয়েটি খুব সাহসেরই পরিচয় দিয়েছে। কারণ ববকাট মানেই মাওবাদী। পুলিশের কাছে ওটুকুই যথেষ্ট, তাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলার জন্য। ২০০৫ সালে কমরেড রিংকির গ্রাম কোরমাতে নাগা ব্যাটালিয়নের সৈন্য এবং সালওয়াজুদুমের লোকেরা আক্রমণ চালায়। রিংকি সে সময় গ্রাম মিলিশিয়ার একজন সক্রিয় সদস্য। তার বান্ধবী লুকি ও সুকিও তাই। তবে তারা আবার কেএএমএসের সদস্য ছিল। গ্রামটি জ্বালিয়ে দেওয়ার পর নাগা ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা লুকি- সুকিসহ আরো কয়েকটি মেয়েকে আটক এবং গণধর্ষণের মাধ্যমে তাদের হত্যা করে। 'তারা তাদের ঘাসের ওপর ফেলে ধর্ষণ করে', বলতে লাগল রিংকি। কিন্তু

সব কর্মসমাধার পর দেখা গেল সেখানে আর কোনো ঘাস নেই। বছরকয়েক আগের ঘটনা এটি। নাগা ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা ইতোমধ্যেই চলে গেছে। তবে পুলিশ এখনো আসে। তারা আসে, যখন তাদের মেয়েমানুষ কিংবা মোরগ- মুরগির দরকার পড়ে। অজিথারও ববকাট চুল। জুদুমের লোকজন তার গ্রাম কোরমিলে হানা দেয়। এ সময় তিনজন গ্রামবাসীকে একটি নালার মধ্যে ফেলে দিয়ে খুন করে তারা। অজিথাও তার গ্রাম মিলিশিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দূর থেকে সে দেখেছে, পারাল নার টোডাক গ্রামের কাছে জুদুমের লোকেরা কীভাবে ছয়জন মহিলাকে ধর্ষণ এবং গলার কাছে গুলি চালিয়ে একজন লোককে হত্যা করেছে। লম্বা চুলের বেনুনি দোলানো চমৎকার একটি মেয়ে কমরেড লক্ষ্মী। তার কাছে শুনেছি কীভাবে জুদুমের লোকজন তার গ্রাম জজরের তিরিশটি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল। 'আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না সে সময়' বলছিল সে। 'শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না আমাদের।' এর পরপরই সে পিএলজিএতে যোগ দেয়। ২০০৮ সালে দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যে ১৫০ জন গেরিলা উড়িষ্যার নয়াগড়ে পৌঁছে পুলিশের একটি অস্ত্রাগারে আক্রমণ চালিয়েছিল লক্ষ্মী তাদেরই একজন। আক্রমণ চালিয়ে গেরিলারা সেই অস্ত্রাগার থেকে ১ হাজার ২০০ রাইফেল ও ২০ হাজার রাউন্ড গোলাবারুদ দখল করে নেয়।

সালওয়াজুদুমের উৎপাত শুরু হওয়ার আগেই ২০০৪ সালে কমরেড সুমিত্রা পিএলজিএতে যোগ দেয়। সে তার ঘরের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই এতে যোগ দিয়েছিল বলে জানায়। আমাকে সে বলেছিল, মেয়েদের এখানে পদে পদে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আমাদের গ্রামে কোনো মেয়েরই গাছে চড়ার নিয়ম নেই। যদি কেউ সেটা করে তবে তাকে ৫০০ রুপি জরিমানা দিতে হবে কিংবা দিতে হবে একটি মুরগি। একজন পুরুষ যদি কোনো মেয়েকে আঘাত করে আর তার পাল্টা হিসেবে মেয়েটিও যদি সেই পুরুষটিকে আঘাত করে তবে সেই মেয়েটিকে গ্রামের জন্য একটি ছাগল দিতে হবে। পুরুষরা শিকারের উদ্দেশ্যে মাসের পর মাস পাহাড়ে কাটাতে পারে কিন্তু একজন মেয়ে সেই শিকারের কাছাকাছিও ঘেঁষতে পারবে না। মাংসের সবচেয়ে ভালো অংশটা যাবে পুরুষের ভাগে। মেয়েদের ডিমও খেতে দেওয়া হতো না। এ অবস্থায় গেরিলাবাহিনীতে যোগ দেওয়া ছাড়া আর কীইবা তাদের করার আছে?

সুমিত্রা তার দুই বান্ধবী তেলাম পার্বতী ও কমলার কাহিনীও বলেছে। ওরা দুজনই কেএএমএসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তেলাম পার্বতীর বাড়ি ছিল দক্ষিণ বাস্তারের পোলেকায়া গ্রামে। অন্যদের মতো সেও দেখেছিল সালওয়াজুদুমের লোকজন কীভাবে তার গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। এরপরই সে পিএলজিএতে যোগ দেয় এবং কেশখাল ঘাট অঞ্চলে কাজ করতে শুরু করে। কমলাকে সঙ্গে নিয়ে ওই অঞ্চলে ২০০৯ সালের ৮ মার্চের নারী দিবস উদ্যাপনের সব প্রস্তুতি শেষ করে সে ও কমলা বাদগো গ্রামের পাশেই ছোট একটি কুঁড়েঘরে অবস্থান নেয়। রাতে পুলিশ সেই কুঁড়েঘরটি ঘিরে ফেলে গুলি করতে শুরু করে। কমলাও পাল্টা গুলি চালিয়ে নিহত হয়। পার্বতী সে সময় পালিয়ে যেতে পারলেও পরদিন ধরা পড়ে এবং খুন হয়। এই- ই ঘটেছিল গত বছরের নারী দিবসে। আর এই তো এবারের নারী দিবসের খবর ছাপা হয়েছে দেখছি একটি জাতীয় দৈনিকে। (নারী অধিকারের পক্ষে বাস্তারের বিদ্রোহীরা. শাহরি খান, নেইল টুডে, রায়পুর, মার্চ ৭, ২০১০)।

দেশ থেকে মাওবাদী ভীতি দূর করতে সরকার হয়তো সব প্রতিরোধ স্থাপনাই সরিয়ে নিতে পারত। কিন্তু ছত্তিশগড় অঞ্চলের একদল বিদ্রোহী এমন কিছু কর্মকান্ডে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে যেগুলোকে তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেয়েও বেশি জরুরি বলে মনে করে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বাস্তার অঞ্চলের মাওবাদীরা সপ্তাহব্যাপী এক 'উৎসব উদ্যাপন'-এর আয়োজন করেছে। উদ্দেশ্য নারী অধিকারের পক্ষে কথা বলা। বাস্তার জেলার বিজাপুরে এ উৎসবের পোস্টারও চোখে পড়েছে। নারী অধিকার আদায়ে সোচ্চার এসব স্বঘোষিত নারীবাদীর কর্মকান্ড রাজ্য পুলিশকে কিছুটা

বিস্মিতই করেছে। বাস্তার পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল টিজে লংকুমার বলেন, কেবল সন্ত্রাস আর রক্তারক্তিতে বিশ্বাসী নকশালদের কাছ থেকে এ জাতীয় আহবান আগে কখনো আর শুনিনি। এর পরই প্রতিবেদনটিতে আইজির বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়, আমার মনে হয় মাওবাদীরা আমাদের জনজাগরণ অভিযান (সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কর্মসূচি) এর বিপুল সাফল্যকে নস্যাৎ করে দিতে চায়। আমরা অপারেশন গ্রিনহান্ট কর্মসূচির পক্ষে জনমত তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েই এই অভিযান চালাতে শুরু করি। পুলিশকে দিয়ে এ অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যই ছিল বামঘেঁষা চরমপন্থীদের উৎখাত করা।

মিথ্যা আর অজ্ঞতার এ মিশেল নতুন কিছু নয়, অস্বাভাবিকও নয়। গুদসাউসেন্ডি পরিচয়ে পার্টির বর্তমান মুখপাত্র হিসেবে যিনি কাজ করছেন এসব বিষয়ে বিস্তারিত তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তার ছোট কম্পিউটার এবং এমপি-৩ রেকর্ডারটি সংবাদ বিবৃতি, প্রতিবাদলিপি, সংশোধনী, পার্টির অবস্থানগত বক্তব্য, মৃতদের তালিকা, টেলিভিশন ক্লিপস এবং বিভিন্ন অডিও- ভিডিও তথ্যচিত্রে ঠাসা। তিনি বললেন, গুদসাউসেন্ডি হিসেবে কাজ করার সবচেয়ে বাজে দিক হচ্ছে পত্রিকা অফিসে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাসম্বলিত বিবৃতি প্রেরণ, যেগুলো কোনোদিনই ছাপা হয় না। তারা আমাদের বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যাচার চালিয়েছে সেসবের সঠিক ব্যাখ্যাসম্বলিত বহু প্রতিবাদলিপি আমরা পাঠিয়েছি। কিন্তু পত্রিকাওয়ালারা এগুলোর কোনোটিই ছাপেনি। অপ্রকাশিত এসব বিবৃতির মোটা আকারের একটি বইও আমরা দেখাতে পারি আপনাকে। কথাগুলো বলার সময় তার চোখেমুখে ঘৃণা তো নয়ই, বরং কিছুটা কৌতুক- কৌতূহলের আভাসই লক্ষ্য করা গেছে। 'আপনাদের বিরুদ্ধে আনীত সবচেয়ে হাস্যকর অভিযোগ কোনটি, যেটা আপনাকে খন্ডন করতে হয়েছে?'

একটু পেছনে ফিরে গেলেন তিনি। ২০০৭ সালে আমাদের এই মর্মে একটি বিবৃতি পাঠাতে হয়েছিল, 'নেহি ভাই, হামনে গাইকো হাতুড়িছে নাহি মারা' (না ভাই, আমরা হাতুড়ি দিয়ে গাভীগুলো মারিনি।) ২০০৭ সালে রমন সিং সরকার গাইযোজনার (গাভী প্রকল্প) ঘোষণা দেয়। এটি ছিল তাদের একটি নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ যোজনার অর্থ হলো প্রতিটি আদিবাসীর জন্য একটি করে গাভী। একদিন দেখি টেলিভিশন চ্যানেল এবং পত্রিকাগুলো এই মর্মে খবর প্রচার করে দিয়েছে, নকশালরা একটি গাভীর পালের ওপর হামলা চালিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সেগুলোকে মেরে ফেলেছে। কারণ তারা হিন্দুবিদ্বেষী এবং বিজেপিবিরোধী। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা কী দাঁড়িয়েছিল। বিষয়টি অস্বীকার করে আমরা এর একটা প্রতিবাদলিপি পাঠাই। নামমাত্র দু- একটি পত্রিকা সেটি ছাপিয়েছিল। পরে জানা গিয়েছিল গাভীগুলো বিলি করার জন্য যার কাছে দেওয়া হয়েছিল সে ছিল একটা দুর্বৃত্ত। সে সেগুলো বিক্রি করে দেয় এবং প্রচার করে, আমরা ওঁৎপেতে বসেছিলাম এবং তার ওপর আক্রমণ চালিয়ে গাভীগুলো মেরে ফেলেছি।

আর সবচেয়ে কঠিন প্রচারণা কোনটি ছিল? 'ওহ্ তার সংখ্যা ডজনকে ডজন। বুঝতে হবে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচারণায় নেমেছে। সালওয়াজুদুম শুরুর প্রথম দিনেই আমবেলি গ্রামে তারা আক্রমণ চালায় এবং আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এরপরই তারা অর্থাৎ বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা, নাগা সৈন্য, পুলিশ সবাই এগুতে থাকে কোটরাপালের দিকে... আপনি নিশ্চয়ই কোটরাপালের কথা শুনেছেন? এটি এক বিখ্যাত গ্রাম। আত্মসমর্পণ না করার অপরাধে ২২ বার আগুন লাগিয়ে গ্রামটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জুদুমের লোকজন যখন কোটরাপাল পৌঁছে আমাদের মিলিশিয়ারা তখন তাদের উদ্দেশ্যে সেখনে ওঁৎপেতে ছিল। দুজন বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হলো, সাতজন মিলিশিয়াদের হাতে ধরা পড়ল আর বাকিরা পালিয়ে গেল। পরদিনই পত্রিকাগুলো লিখল, নকশালরা গরিব আদিবাসীদের নৃশংসভাবে খুন করেছে। কোনো কোনো পত্রিকা লিখেছে, আমরা নাকি শয়ে শয়ে মানুষ হত্যা করেছি। এমনকি ফ্রন্টলাইনের মতো স্বনামধন্য একটি পত্রিকাও লিখল, আমরা নাকি ১৮ জন নিরপরাধ

আদিবাসীকে হত্যা করেছি। তা ছাড়া কে বালাগোপালের মতো একজন মানবাধিকার কর্মী যিনি সাধারণত ঘটনার বস্তুনিষ্ঠতার ব্যাপারে খুবই সজাগ তিনিও একই কথা বললেন। আমরা প্রকৃত ঘটনা ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি পাঠাই, কিন্তু কোনো পত্রিকাই তা ছাপল না। পরে অবশ্য বালাগোপাল তার বইয়ে এই ভুলের কথাটি স্বীকার করেছেন... তবে কে সেসব দেখে?

আমি তার কাছে আটক সাতজনের পরে কী হয়েছিল জানতে চাইলাম। সে বলতে থাকেন, আঞ্চলিক কমিটি একটি জনআদালন (গণআদালত) বসাল। চার হাজার লোক সেখানে উপস্থিত হয়। তারা পুরো ঘটনাটি শোনে। দুজন বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। পাঁচজনকে সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হয়। জনগণই এ জাতীয় সিদ্ধান্ত নেয়। আজকাল আবার জনগণের ভেতরেই বিভিন্ন গুপ্তচরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এটা বড় ধরনের একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরও জনগণ ব্যাপারগুলো শোনে, কী ঘটেছে অবহিত হয়, তারা অপরাধীদের স্বীকারোক্তিও শোনে এবং বলে ইছকা হাম রিস্ক নেহি লে সাকতে (এসব লোককে বিশ্বাস করার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না)। অথবা 'ইছকা রিস্ক হাম লেঙ্গে' (আমরা এসব লোককে বিশ্বাস করার ঝুঁকি নিতে রাজি আছি)। সংবাদমাধ্যম সব সময় যে কজন গুপ্তচর মারা পড়ে তাদের খবর প্রচার করে। কিন্তু বিপুলসংখ্যক গুপ্তচরকে ধরাপড়া সত্ত্বেও যে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সেসব খবর কখনো প্রচার করে না। তা ছাড়া এসব গুপ্তচরের হাতে কত মানুষ যে মারা পড়ে সেসব খবরও প্রচার করে না তারা। ফলে সবাই ধরে নেয় এটি এমন একটি রক্তপিপাসু প্রক্রিয়া যার মধ্যে পড়লে কেউ আর জীবিত ফেরত আসে না। এটি আসলে প্রতিশোধমূলক কিছু নয়। এটি হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষগুলোর জীবন রক্ষার একটি প্রক্রিয়া...। তবে হ্যাঁ, সমস্যা তো এক্ষেত্রে কিছু আছেই। আমরা মাঝে মাঝে ভয়াবহ কিছু ভুলও করে ফেলি। আমরা ওঁৎপেতে থেকে অনেক সময় পুলিশ ভেবে ভুলে অন্য মানুষকেও খুন করে ফেলেছি। তবে সংবাদমাধ্যম বিষয়গুলো যেভাবে প্রচার করে ব্যাপারটি ঠিক সেরকম নয়। ভয়ংকর 'গণআদালত'। এটিকে কীভাবে মেনে নেব আমরা? অথবা নিষ্ঠুর এ বিচারব্যবস্থাকেই বা কীভাবে অনুমোদন করা যায়? অন্যদিকে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়ার নাম করে হত্যাকান্ডের বিষয়গুলোকেই বা আমরা কীভাবে দেখব? এগুলো তো একেবারেই সাজানো এবং বলা যায় এগুলো হচ্ছে এক ধরনের তড়িঘড়ি বিচারকার্য। এসব করেই তো পুলিশ এবং সেনা সদস্যরা সাহসিকতার জন্য পদক পায়। নগদ অর্থ দিয়েও তাদের পুরস্কৃত করা হয় কিংবা ভারত সরকার তাদের সময় হওয়ার আগেই পদোন্নতি দিয়ে দেয়। যত বেশি হত্যা করবে তত বেশি তারা পুরস্কৃত হবে। 'বন্দুকযুদ্ধে নিহত' দেখিয়ে হত্যা করায় পারদর্শীরা 'সাহসী হৃদয়' হিসেবে খ্যাত আর আমরা যারা এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস দেখাই তাদের 'দেশবিরোধী'রূপে চিত্রায়িত করা হয়।

আর সুপ্রিমকোর্ট নির্লজ্জের মতোই স্বীকার করলেন, যথেষ্ট সাক্ষী- সাবুদ না থাকা সত্ত্বেও সে মুহাম্মদ আফজালকে (২০০১ সালের পার্লামেন্ট হামলায় অভিযুক্ত) মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন কারণ হামলাকারীকে এর চেয়ে কম কোনো শাস্তি দিয়ে সমাজের সম্মিলিত বিবেককে সন্তুষ্ট করা যেত না। এ বিষয়টিইবা কীভাবে দেখব আমরা।

আর যাই হোক, কোটরাপালের জনআদালতের জনতা কিন্তু শারীরিকভাবে অন্তত উপস্থিত ছিল নিজেদের রায় ঘোষণার জন্য। এই রায় কিন্তু বিচারকদের দ্বারা ঘোষিত হয়নি যারা বহু আগে হতেই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। সম্ভবত অনুপস্থিত জনবিবেকের হয়ে কথা বলার জন্যই তারা এ কাজটি করেছেন। আমি ভেবে পাই না কোটরাপালের জনগণ অন্য আর কী করতে পারত? পুলিশকে খবর পাঠাত? ঢোলের শব্দ বেশ জোরেই শোনা যাচ্ছিল। এখন ভূমকলের সময়। আমরা মাঠে গিয়ে পৌঁছলাম। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি। এ যে জনসমুদ্র। উত্তাল- উদ্বেলিত

অপূর্ব জনারণ্য। আদিবাসী বাহারি সাজে সজ্জিত সবাই। মেয়েদের চেয়ে ছেলেরাই যেন সাজসজ্জায় বেশি তৎপর। মাথায় তাদের পাখির পালকের উষ্ণীষ, মুখে আঁকা নানা রঙের উল্কি। অনেকের আবার চোখেও সাজ, মুখে প্রলেপ সাদা পাউডারের। অসংখ্য মিলিশিয়া, মেয়েরা পরেছে নানা রঙের শাড়ি; কাঁধে ঝোলানো রাইফেল। আছে বৃদ্ধ আর শিশুরাও। আকাশে উড়ছে লাল রঙের পতাকা। বেশ উপরে সূর্য এখন তীব্র। কমরেড ল্যাং বলতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন জনতা সরকারের কর্মকর্তারাও উপস্থিত। আছেন কমরেড নিতিও। অসাধারণ এই মহিলা ১৯৯৭ সাল থেকেই পার্টির সঙ্গে জড়িত। জাতির জন্য তিনি এতটাই হুমকিস্বরূপ যে, ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে তাকে ধরার জন্য সাতশ'রও বেশি পুলিশ ইন্নার গ্রামটি ঘিরে ফেলেছিল। কারণ তাদের কাছে খবর ছিল, নিতি ওই সময়ে সেই গ্রামেই অবস্থান করেছিলেন। কমরেড নিতিকে যে এতটা ভয়ংকর হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তাকে ধরার জন্য যে পুলিশ এতটা হন্যে হয়ে তাড়া করছে তার কারণ এই নয়, বহু হামলায় তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন (অবশ্য তিনি তা করেছিলেন)। আসল কারণ হলো তিনি একজন আদিবাসী নারী এবং গ্রামের মানুষ তাকে প্রচন্ড রকম ভালোবাসে। আর তরুণদের জন্য তিনি যথার্থই একজন অনুপ্রেরণাদাত্রী। তিনি তার একে রাইফেলটি (এটি একটি বন্দুক। এর একটি ইতিহাস আছে। প্রায় প্রত্যেকের বন্দুকের একটি ইতিহাস আছে। কার কাছ থেকে এটি কেড়ে আনা হয়েছিল, কীভাবে আনা হয়েছিল এবং কেইবা এনেছিল) কাঁধে ঝুলিয়ে কথা বলছিলেন। সিএনএমের একটি দল ভূমকল বিদ্রোহের ওপর একটি নাটক মঞ্চস্থ করল। খারাপ প্রকৃতির শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীদের ভূমিকায় অভিনয়কারীরা চুল হিসেবে সোনালি রঙের খড়কুটা ব্যবহার করল এবং মাথায় পরল টুপি। অন্যদিকে রুদ্রমূর্তি আদিবাসীদের গায়ে ছিল গাছের ছালবাকল। নাটক দেখে দর্শকরা যারপরনাই মুগ্ধ। দক্ষিণ গঙ্গালাউর থেকে আগত একটি দলও নাটক প্রদর্শন করল। এটির নাম নীতির জুদুম পিতু (রক্ত জরানোর কাহিনী)। জুরি বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে বলল। এটি এক বৃদ্ধ দম্পতির কাহিনী। তারা তাদের মেয়েকে দেখতে তার গ্রামে যাচ্ছিল। তারা যখন বনের পাশ ধরে হাঁটছিল তখন একপর্যায়ে আর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। কারণ চারদিকের সবকিছু আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো কিছুই চেনা যাচ্ছিল না। সালওয়াজুদুম গ্রামের লোকজনের এমনকি ঢাকঢোলসহ বাদ্যযন্ত্রগুলোও পুড়িয়ে দিয়েছিল। তবে এসবের ছাইভস্ম পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কারণ বৃষ্টি সবকিছু ধুয়েমুছে নিয় গেছে। তারা তাদের মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছিল না। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বৃদ্ধ দম্পতি বিষাদের গান ধরল। আর তাদের কণ্ঠস্বর শোনার পরপরই পুড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রতিউত্তরে তাদের মেয়েও গান গেয়ে উঠল। সে গাইতে লাগল : আমাদের গ্রামটি এখন নীরব- নিস্তব্ধ। এখানে এখন ধান মাড়াইয়ের কোনো শব্দ নেই। নেই ঝরনার কলধ্বনি, পাখিদের কলকাকলি থেমে গেছে। শোনা যায় না ছাগল- ভেড়ার ডাকও। আমাদের আজন্মের সুখের বন্ধন হঠাৎ করেই যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

বাবাও আবার গেয়ে উঠল : লক্ষ্মী মা আমার, আজ আর কাঁদতে নেই। জন্ম নিলে যে একদিন মরতেই হয়। আমাদের চারপাশের এই বৃক্ষরাজি একদিন শেষ হয়ে যাবে, ফুলেরা ফুটেই আবার ঝরে পড়বে। একদিন এই পৃথিবীও জীর্ণ হয়ে আসবে। কিন্তু কার কারণে আমাদের মরতে হচ্ছে? আমাদের লুণ্ঠনকারীরা একদিন বুঝতে পারবে। সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই। তবে আমাদের জনগণ কোনোদিনই তোমাকে ভুলবে না, হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও না।

আরো কিছু বক্তৃতা। এর পরই শুরু হলো বাদ্য আর নৃত্য। প্রতিটি জনতা সরকারেরই নিজস্ব দল রয়েছে। প্রতিটি দলই তাদের নিজ নিজ নৃত্য ঠিক করে এসেছে। তারা এক এক করে এগিয়ে আসছে আর উচ্চগ্রামের বাজনার তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে চলেছে। নাচের ভেতর দিয়ে উপস্থাপন করে যাচ্ছে অরণ্যের একেকটি কাহিনী। তবে প্রতিটি দলের কাহিনীতেই ব্যতিক্রমহীনভাবে একটি চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সেটি হলো খারাপ প্রকৃতির এক খনি খননকারী। মাথায় তার হেলমেট, চোখে কালো চশমা, আর হাতে সাধারণত ধূম্র উদগিরণকারী সিগারেট। তবে তাদের নাচের মধ্যে এতটুকু জড়তা বা

কৃত্রিমতার ছোঁয়া ছিল না। যতই তারা নাচছে ততই ধুলা উড়ছে। বাজনার শব্দে একসময় কানে তালা লাগার জোগাড়। জনসমুদ্র ক্রমেই আন্দোলিত হতে শুরু করে একসময় নাচে মেতে উঠল। তারা নাচতে শুরু করল ছয়জন কিংবা সাতজন করে দলে দলে ভাগ হয়ে, ছেলে আর মেয়ে আলাদা আলাদাভাবে। একে অন্যের কোমর পরস্পরের বাহুতে জড়িয়ে। হাজার হাজার মানুষ। এর জন্যই তাদের আসা। ঠিক এ জন্যই। এই দন্ডকারণ্যের জঙ্গলে তারা জানে, আনন্দটা কীভাবে করতে হয়, কীভাবে উপভোগ করতে হয় জীবনটাকে। তারা মাইলের পর মাইল হাঁটবে, দিনের পর দিন হাঁটবে, খাবে- দাবে, গান করবে। ছেলেদের মাথায় থাকবে পালকের ঝুটি আর মেয়েদের খোঁপায় ফুল। তারা হাতে হাত রাখবে, মহুয়ায় মাতাল হবে, নৃত্যমুখর কাটবে সারা রাত। একা একা কেউই তারা নাচে না বা গান করে না। এসব থেকেই বোঝা যায়, যে সভ্যতা তাদের ধ্বংস করার জন্য প্রতিনিয়ত পাঁয়তারা করছে সে সভ্যতাকে তারা কীভাবে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে।

আমার বিশ্বাসই হতে চাচ্ছে না, এর সবকিছু পুলিশের নাকের ডগায়ই ঘটে চলেছে। সবকিছুই ঘটছে অপারেশন গ্রিনহান্টের আওতার মধ্যেই। প্রথম দিকটায় পিএলজিএ- এর কমরেডরা অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে থেকেই নৃত্যরত মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু একটা সময় তারা নিজেদের আর ধরে রাখতে পারে না, যেমনটা বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য হাঁসদের সাঁতার কাটতে দেখা হাঁসদের আর তর সয় না নিজেরাও পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার। একে একে তারাও এসে যোগ দেয়, নাচতে শুরু করে। দ্রুতই চোখে পড়ল জলপাই সবুজ নৃত্যরতদের সারি। চক্রাকার নৃত্যে মেতে উঠেছে তারা অন্যদের সঙ্গে। এর পর এখানেই কারো বা বোনের সঙ্গে কারো বা ভাইয়ের সঙ্গে। কারো বা আবার বাবা, মা কিংবা ছেলেমেয়ে। অথবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কয়েক মাস পর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক বছরও পরে। সারিগুলো এ সময় ভেঙে গিয়ে আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে। জলপাই সবুজ রংগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে চক্রাকারে। নৃত্যরত বাহারি রঙের শাড়ি, ফুল, ঢোল, করতাল আর আন্দোলিত ঝুটির মধ্যে। কোনো সন্দেহ নেই এটিই হচ্ছে পিপলস আর্মি (জনযোদ্ধা বাহিনী)। অন্তত এই মুহূর্তের জন্য তো বটেই। চেয়ারম্যান মাও গেরিলাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে বলেছিলেন, 'গেরিলারা হচ্ছে মাছ। আর জনগণ হচ্ছে পানি যে পানিতে গেরিলারা সাঁতার কাটে।' এই মুহূর্তে কথাটি আমার কাছে আক্ষরিক অর্থেই সত্য বলে মনে হচ্ছে।

চেয়ারম্যান মাও। এখানেও আছেন তিনি। তবে সম্ভবত একটু নিঃসঙ্গ, তবু তিনি উপস্থিত। তার একটি ছবি ঝুলছে লাল কাপড়ের পর্দার ওপর সাঁটা। মার্কসও আছেন। আছেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের উদগাতা ও প্রধান তাত্ত্বিক চারু মজুমদারও।

তার সম্মোহনী বাগ্মিতা হিংস্রতা, রক্তাক্ততা ও আত্মহননপ্রবণতার প্রতি অন্ধ এক ভাবাবেগ এবং আকর্ষণের জন্ম দিয়েছিল। মাঝে মাঝে তিনি এমন সব নিষ্ঠুর কথাবার্তা বলতেন যা কিনা ছিল প্রায় গণহত্যারই শামিল। বর্তমান এই বিপ্লব সংঘটনে তার বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা তুলনাহীন। তারপরও আজকের এই ভূমকল দিবসে দাঁড়িয়ে না বলে পারছি না, তার চিন্তা- চেতনায় আজকের এই বৈপ্লবিক আবেগ ও বিন্যাসটি অনুপস্থিতই ছিল। তিনি বলতেন, নিশ্চিহ্নকরণের মধ্যদিয়েই নতুন মানুষ জন্ম নেবে যারা মৃত্যুকে তোয়াক্কা করে না এবং সব ধরনের ব্যক্তিস্বার্থ থেকে থাকবে মুক্ত। তিনি কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন, আজকের এই আদিবাসী মানুষই যারা গভীর রাতঅবধি নেচে- গেয়ে কাটাবে, একদিন তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেবে?

আজকের এই আনন্দবন্যার প্রকৃত চিত্রটি হয়তো বাইরের জগতে পৌঁছবে না, বরং বাইরের মানুষ জানবে এ সবই হচ্ছে অতীতে সমস্যাসংকুল এক পার্টির জন্মদাতার কঠিন, অনমনীয় ও অবাস্তব সব

চিন্তাভাবনারই ফসল। এটা দুর্ভাগ্যজনক। চারু মজুমদার তার বিখ্যাত 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান এবং চীনের পথই আমাদের পথ' উক্তির মধ্যদিয়ে নিজেকে এমন পর্যায়েই নিয়ে গিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণহত্যা চালানো সত্ত্বেও নকশালরা এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন। কারণ সে সময় চীন ছিল পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

] কম্বোডিয়ায় খেমাররুজ বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সময়ও নীরবতা লক্ষ্য করা গেছে নকশালদের। রুশ এবং চীন বিপ্লবের সময় যে নিষ্ঠুরতার বাড়াবাড়ি হয়েছিল তা নিয়েও সোচ্চার হতে দেখা যায়নি তাদের। তিববত নিয়েও কথা শোনা যায়নি। এমনকি নকশাল আন্দোলনের সময়ও অতিমাত্রায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। তাদের অনেক কর্মকান্ডের পক্ষেই যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাদের কোনো কাজেরই কি পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লি, মুম্বাই এবং গুজরাটে কংগ্রেস ও বিজেপির যে নোংরা অর্জন সেগুলোর সঙ্গে তুলনা চলে? এবং হ্যাঁ, ভয়ংকর রকমের সব বৈপরীত্য সত্ত্বেও চারু মজুমদার যেসব কথা বলেছেন বা লিখে গেছেন তা থেকে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন একজন স্বাপ্নিক মানুষ। তার প্রতিষ্ঠিত পার্টিই (এবং এর অসংখ্যা গ্রুপ) ভারতে প্রকৃত বিপ্লবের স্বপ্ন এখনো জিইয়ে রেখেছে। যে সমাজ এমন একটি স্বপ্নকে লালন করে না তেমন একটি সমাজের কথা একবার কল্পনা করুন তো। অন্তত এ কারণেই তার প্রতি আমরা এতটা কঠোর হতে পারি না। বিশেষত আমরা যখন অহিংস মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য গান্ধীর ধর্মীয় বাগাড়ম্বর এবং তার ট্রাস্টিশিপের মতো অলীক ধারণার সঙ্গে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলি তখন তো না-ই। যেমন গান্ধী বলেছেন, 'ধনীদের নিজেদের কাছেই তাদের সম্পদ গচ্ছিত থাকবে। এ থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে তার যেটুকু দরকার সেটুকুই সে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করবে। বাদবাকিটুকুর জন্য সে হবে একজন অছি বা ট্রাস্টি যেটুকু সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।'

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ভারতের বর্তমান জারেরা অর্থাৎ রাজ্য সরকার যারা নির্মমভাবে নকশালদের হত্যা করেছিল তারাই এখন বহু আগে চারু মজুমদারের দেওয়া স্লোগান নিজেদের গলায় তুলে নিতে যাচ্ছেন। চারু মজুমদার সেদিন বলেছিলেন : চীনের পথই আমাদের পথ। সব কেমন ওলটপালট, এলোমেলো। চীনের পথ পাল্টে গেছে। এখন সে এক সাম্রাজ্যিক শক্তি। অন্য দেশ, অন্য জনগণের সম্পদের দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু পার্টি এখনো সঠিক পথেই আছে যা কেবল নিজের মনটি একটু পরিবর্তিত হয়েছে।

পার্টি যখন জনগণের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় (যেমনটা এখন দন্ডকারণ্যে ঘটেছে), তাদের আস্থা অর্জন করে, তাদের প্রয়োজনগুলোর ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে ওঠে তখন সত্যি সত্যি সেটি পিপলস পার্টি হয়ে ওঠে, তার সৈন্যবাহিনীও হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থেই একটি পিপলস আর্মি। কিন্তু বিপ্লবের পর কত সহজেই না ভালোবাসার এই সম্পর্কটি তিক্ত এক বিবাহবন্ধনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অবলীলায় পিপলস আর্মি জনগণের ওপর চড়াও হতে পারে। আজ এই দন্ডকারণ্যে পার্টি বকসাইটগুলোকে পাহাড়ের মধ্যেই রেখে দিতে চায়। কাল কি সে আবার তার মত পাল্টাবে? কিন্তু আমরাই কি ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে বর্তমানে নিজেদের নিশ্চল করে রাখব?

নৃত্যগীত সারারাত ধরেই চলবে। আমি ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ম্যাসি এখনো জেগে আছে। শেষরাত অবধি গল্প করে কাটালাম আমরা। আমার নেরুদার ক্যাপ্টেনস ভার্সেস বইটি (ঘটনাক্রমে এটি আমার সঙ্গেই ছিল) তাকে দিলাম। সে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, বাইরের জগৎ আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে? ছাত্ররাই বা আমাদের সম্পর্কে কী বলে? নারী আন্দোলনের বিষয়ে কিছু বলুন, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় ইস্যু কি? সে আমার সম্পর্কেও জানতে চায়, আমার লেখালেখি সম্পর্কে। আমাকে নিয়ে যে কথাবার্তা হচ্ছে সে সবের একটা সঠিক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

এবার সে নিজের সম্পর্কে বলতে শুরু করল, কীভাবে সে পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। সে জানাল, গত মে মাসে তার জীবনসঙ্গীটিকে পাতানো এক বন্দুকযুদ্ধে হত্যা করা হয়। নাসিকে তাকে গ্রেফতার করার পর হত্যার উদ্দেশ্যে ওয়ারাঙ্গালে নিয়ে যাওয়া হয়। 'নিশ্চয়ই তারা তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল।' তার গ্রেফতারের খবর পেয়ে সে তাকে দেখতে যাচ্ছিল। ম্যাসির বসবাস বরাবরই জঙ্গলে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সে জানাল, বেশ কয়েক বছর আগে আরো একবার সে বিয়ে করেছিল। সেই ছেলেটিও এক বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়। তবে হৃদয়নিংড়ানো একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলল, সেটি ছিল সত্যিকারেরই একটি বন্দুকযুদ্ধ।

চোখ মেলেই আমি আমার ঝিল্লির ওপর কাত হয়েছিলাম। ভাবছিলাম ম্যাসির দীর্ঘস্থায়ী বেদনার কথা। কান পেতে শুনছিলাম ঢোলের শব্দ আর মাঠ থেকে ভেসে আসা দীর্ঘস্থায়ী আনন্দের উতরোল কলরব। একই সঙ্গে ভাবছিলাম চারু মজুমদারের কথাও – তার প্রলম্বিত যুদ্ধের ধারণা, যা কিনা মাওবাদী পার্টির মূল কর্মপদ্ধতি। আর এ কারণেই মাওবাদীরা 'শান্তি আলোচনায়' যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখালেই লোকজন তা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা মনে করে এটি আসলে চালাকি। এটি হচ্ছে মাওবাদীদের নিজেদের পুনর্গঠিত করে, নতুন করে সশস্ত্র করে, আবারো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণের কৌশলমাত্র। প্রলম্বিত যুদ্ধটা আসলে কী? পদ্ধতিগতভাবেই কি এটা ভয়ংকর একটা কিছু, নাকি যুদ্ধের ধরনের ওপর নির্ভর করে এটি দীর্ঘস্থায়ী হবে কি হবে না? এই দন্ডকারণ্যের মানুষ যদি ত্রিশ বছর ধরে প্রলম্বিত এক যুদ্ধে লেগে না থাকত তাহলে আজকের দিনে কি তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত?

কেবল মাওবাদীরাই কি প্রলম্বিত যুদ্ধের নীতিতে বিশ্বাসী? বলা চলে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকেই ভারত একটি ঔপনিবেশিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় – রাষ্ট্রীয় সীমানা বাড়ানো এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে। এই রাষ্ট্রটি রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, গোয়া, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, তেলেঙ্গানা, আসাম, পাঞ্জাব এবং নকশাল আন্দোলন- অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বর্তমানে মধ্যভারতের আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে সামরিক অভিযান চালাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি। লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, নির্যাতন চালানো হয়েছে অসংখ্য মানুষের ওপর।

এর সবকিছুই ঘটেছে আবার গণতন্ত্র নামের সুবোধ মুখোশটির আড়ালে। কাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ? মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, কমিউনিস্ট, দলিত না আদিবাসীদের বিরুদ্ধে? যুদ্ধের বেশির ভাগ আয়োজনই সেই সব গরিব মানুষের বিরুদ্ধে যারা তাদের দিকে ছুড়ে দেওয়া সামান্য রুটির টুকরোটি লুফে নেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের ভাগ্য নিয়েই প্রশ্ন তোলার সাহস দেখিয়েছে। ভারত নামক রাষ্ট্রটি যে প্রকৃত অর্থেই উচ্চবর্ণের একটি হিন্দুরাষ্ট্র এ সত্যটি মেনে না নিয়ে আর উপায় নেই (যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন)। এরা পরস্পরের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব পোষণ করে। রাষ্ট্রটি যে আসলেই ঔপনিবেশিক মেজাজের তার প্রমাণ হলো সে নাগা এবং মিজোদের ছত্তিশগড়ে যুদ্ধ করতে পাঠায়। একইভাবে পাঠায় শিখদের কাশ্মীরে, কাশ্মীরিদের উড়িষ্যায় কিংবা তামিলদের আসামে। এগুলো যদি প্রলম্বিত যুদ্ধ না হয় তো প্রলম্বিত যুদ্ধ কোন গুলি? চমৎকার তারকোজ্জ্বল রজনীতে অপ্রিয় সব চিন্তাভাবনা।

সুকদেব নিজে নিজেই হাসছিল। মুখখানি তার সঙ্গে থাকা কম্পিউটার স্ক্রিনের আভায় ইষৎ আলোকিত। ভয়ানক কাজপাগল মানুষ সে। কী নিয়ে ভাবছে তার কাছে জানতে চাইলাম। সুকদেব বলে, গতবার ভূমকল দিবস দেখতে যেসব সাংবাদিক এসেছিলেন তাদের কথাই ভাবছিলাম আমি। তারা এক- দুই দিনের জন্য এসেছিলেন। একজন আমার একেটির (একে রাইফেল) পাশে দাঁড়িয়ে নিজের একটি ছবিও

তুললেন। তারপর ফিরে গিয়ে আমাদের সম্পর্কে লিখলেন, আমরা নাকি খুনে বাহিনী বা ওই জাতীয়ই অন্য কী সব।

সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু নাচের বিরাম নেই। এখনো সারিসারি মানুষ। শত শত তরুণ- তরুণী নেচেই চলেছে। কমরেড রাজু বললেন, নাচ তারা থামাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বাক্সপেটরা গোছাতে শুরু করি।

আগ বাড়িয়ে আমি ডাক্তার কমরেডটির কাছে গেলাম। যেখানে লোকজন নাচানাচি করছিল তার পাশেই ছোট একটি চিকিৎসা শিবির খুলেছে সে। ইচ্ছে হচ্ছিল তার তুলতুলে গালটায় চুমু খাই। কেন যে সে একজন না হয়ে অন্তত জনাতিরিশেক হলো না? অথবা হাজারখানেক মানুষই বা এখানে নেই কেন তার মতো? আমি তার কাছে দন্ডকারণ্যের মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে চাইলাম। কিন্তু তার উত্তর শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। সে আমাকে জানাল, তার দেখা এখানকার অধিকাংশ মানুষেরই এমনকি পিএলজিএ'র সদস্যদেরও রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ৫ থেকে ৬ এর মধ্যে (একজন ভারতীয় নারীর রক্তে এই হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক মাত্রা থাকার কথা ১১)। দীর্ঘ কয়েক বছরের রক্তস্বল্পতার কারণে কেউ কেউ যক্ষ্মায় আক্রান্ত। ছোট ছোট শিশুরা আমিষের অভাবজনিত গ্রেড- ২ রোগে ভুগছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই রোগটিকে বলা হয় কাওশিয়ারকা (পরে আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি এই শব্দটি এসেছে ঘানার উপকূলীয় অঞ্চলের গা ভাটা থেকে, যার অর্থ নতুন শিশুটির জন্ম তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাই অথবা বোনটিকে অসুস্থ করে দেয়। অর্থাৎ একটি শিশু জন্ম নেওয়ার সঙ্গে মা তার আগের সন্তানটিকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেয়। আবার এই শিশুটির মুখে তুলে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর কোনো খাবারও নেই। ফলে শিশুটি দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে)। কমরেড ডাক্তার জানাল, বিআদরা অঞ্চলের মতো এখানেও এই রোগটি মহামারী আকারে বিরাজ করছে। আগেও আমি অনেক গ্রামে কাজ করেছি কিন্তু এখানকার মতো এমন অবস্থা কোথাও দেখিনি।

এ ছাড়াও এখানকার মানুষ ম্যালেরিয়া, হাড়ক্ষয়, ফিতাকৃমি, কান ও দাঁতে মারাত্মক ঘা এবং বিশেষ করে ঋতুবতী হওয়ার সময় যেসব মেয়ে অপুষ্টিতে ভুগেছে তারা অকালীন ঋতু বন্ধ হয়ে যাওয়ার রোগে ভুগছে।

গাদাচিরুলি এলাকায় একটি কি দুটি বাদে এই জঙ্গলে কোনো ক্লিনিক- ডাক্তার নেই, নেই কোনো ওষুধপথ্যও।

সে তার ছোট দলটি নিয়ে আভুজমাদের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। দিনআষ্টেক সময় লাগবে সেখানে পৌঁছতে। কমরেড তার ডাক্তারি পোশাকটিও পরে নিয়েছে। সুতরাং দৃশ্যগোচর হওয়া মাত্রই সে গুলিবিদ্ধ হতে পারে। কমরেড রাজু জানাল, এই জায়গায় আর বেশিক্ষণ পড়ে থাকাটা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আমাদের অন্য কোথাও যেতে হবে। ভূমকল উদ্যাপন অনুষ্ঠান ছেড়ে যাওয়ার আগে অনেকের কাছ থেকেই বেশ কিছুটা সময় ধরে বিদায় নেওয়ার পালা।

লাল লাল সালাম, লাল লাল সালাম,

জানেওয়ালে মাখিও কো লাল লাল সালাম,

(সামনে আগুয়ান কমরেডদের লাল সালাম)

www.freebanglabooks.com

ফির মিলেঙ্গে ফির মিলেঙ্গে

দন্ডকারণ্য জাঙ্গল মেয় ফির মিলেঙ্গে

(আবারো একদিন এই দন্ডকারণ্যে অরণ্যে আমরা মিলিত হব।)

আসা ও যাওয়ার সময়কার এই কথাবার্তা বা সম্ভাষণগুলোকে কেউই কখনো হালকাভাবে নেয় না। কারণ প্রত্যেকেই জানে, তারা যখন বলে 'আবারো আমাদের দেখা হবে' তখন তারা বোঝায় আমাদের মধ্যে জীবনে আর হয়তো দেখা নাও হতে পারে। কমরেড নর্মদা, কমরেড ম্যাসি ও কমরেড রুপি ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরল। জীবনে আর কি আমি তাদের কখনো দেখা পাব?

সুতরাং আবারো আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। তপ্ততার মাত্রা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। মৌসুমের প্রথম টেন্ডু ফলটিই কমলা আমার জন্য ছিঁড়ে আনল। এর স্বাদ অনেকটা চিকু ফলের মতো। ইতোমধ্যেই টকের প্রতি আমার যেন একটা আসক্তি জন্মে গেছে। এবার আমরা একটা নদীর ধারেই তাঁবু গাড়লাম। ছেলে আর মেয়েরা আলাদা- আলাদাভাবে দলবদ্ধ হয়ে স্নান করছিল।

সন্ধ্যায় কমরেড রাজুর কাছে পুরো এক প্যাকেট 'বিস্কুট' এসে পৌঁছল। লেখা আছে : ২০১০ এর জানুয়ারির শেষ নাগাদ মনপুর বিভাগে ৬০ ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন। তবে এখনো তাদের আদালতে হাজির করা হয়নি। দক্ষিণ বাস্তারে প্রচুর পরিমাণ পুলিশ এসেছে। বেপরোয়া আক্রমণ চলছে। ২০০৯ সালের ৮ ডিসেম্বর বিজাপুর জেলার কাচলারাম গ্রামে দিরকো মাদকা (৬০) ও কবাসি সুকলু (৬৮) খুন হয়েছেন। ২৪ নভেম্বর মাধবী বাসন (১৫) নিহত হয়েছে পাংগুদি গ্রামে। ৩ ডিসেম্বর কোরেনজাদে খুন হয়েছেন মাধবী বাদরাস। ১১ ডিসেম্বর দারবা বিভাগের গুমিয়াপাল গ্রামে সাতজন নিহত হয়েছেন (নাম এখনো পাওয়া যায়নি)। ১৫ ডিসেম্বর কোটরাপাল গ্রামে বেকু সমবার ও মাধবী সাত্তি (উভয়েই কেএএমএসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) খুন হয়েছেন। ৩০ ডিসেম্বর বেচপাল গ্রামের পুনেম পান্ডু ও পুনেম মটু (পিতা- পুত্র) খুন হয়েছেন। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে (তারিখ নেই) কাইকা গ্রামের জনতা সরকারপ্রধান গঙ্গালাউর নিহত হয়েছেন। ৯ জানুয়ারি জাগারগোন্দা অঞ্চলের সুরপাংগুদেন গ্রামে চারজন খুন হয়েছেন। ১০ জানুয়ারি পুলেমপুল্লাদি গ্রামে খুন হয়েছেন তিনজন (নাম এখনো জানা যায়নি)। ২৫ জানুয়ারি ইন্দ্রাবতী অঞ্চলের তাকিলদ গ্রামে সাতজন নিহত হন। ১০ ফেব্রুয়ারি (ভূমকল দিবসে) আভুজমাদের দুমনার গ্রামে কামলিকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। তার বাড়ি ছিল পাইবার গ্রামে। ভারত- তিব্বত সীমান্ত টহল বাহিনীর ২ হাজার সৈন্য রাজনন্দগাঁও জঙ্গলে তাঁবু ফেলেছে। বিএসএফের আরো ৫ হাজার সৈন্য কানকারে এসে পৌঁছেছে।

এবং : পিএলজিএ'র কোটা পূরণ হয়ে গেছে। তারিখসহ কয়েকটি পত্রিকা এসে পৌঁছেছে। এগুলোয় নকশালদের নিয়ে প্রচুর খবর ছাপা হয়েছে। ভয়াবহ একটি শিরোনামে পুরো রাজনৈতিক পরিস্থিতির আসল চিত্রটিই ধরা পড়েছে : খাদেদো, মারো, সমর্পণ করাও (নিশ্চিহ্ন করো, খুন করো, তাদের আত্মসমর্পণ করাও)। এর নিচেই রয়েছে : বার্তা কি লিয়ে লোকতন্ত্র কা দোর খুলা হ্যায় (আলোচনার জন্য গণতন্ত্রের দরজা সব সময়ই খোলা)। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, টাকা কামানোর জন্য মাওবাদীরা মাদক চাষ শুরু করেছেন। তৃতীয় পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, আমরা যে অঞ্চলটিতে তাঁবু গেড়েছি এবং চলাফেরা করছি সেই অঞ্চলটি পুরোপুরিই পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তরুণ কমিউনিস্টরা পত্রিকার ক্লিপিংগুলো নিয়ে গিয়ে পড়ার অভ্যাস করছেন। তারা ক্যাম্পের চারদিকে ঘুরছেন আর রেডিওর ঘোষকের মতো উচ্চৈঃস্বরে সেগুলো পাঠ করছেন।

নতুন দিন। নতুন জায়গা। আমরা উশির গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে তাঁবু গাড়লাম। চারদিকে মহুয়া গাছের ছড়াছড়ি। সবে মহুয়ার ফুল ফুটতে এবং বিবর্ণ সবুজ কুঁড়িরা ঝরে পড়তে শুরু করেছে। অরণ্যের ভূমিতলে যেন এক একটি মুক্তাকণা। বাতাসে মহুয়ার হালকা মাদকতা। আমরা ভাটপাল স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য অপেক্ষা করছি। অগনারের বন্দুকযুদ্ধের পর স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন সেখানে একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। শিশুদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিউল্যান্ড, মুঞ্জমিটা, এদকা, বেদমাকট ও ধালোরার স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে। ভাটপাল স্কুলের শিশুরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত এল না।

কমরেড নিতি (যাকে ধরার জন্য আপ্রাণ পুলিশি চেষ্টা চালানো হচ্ছে) এবং কমরেড বিনোদ আমাদের বেশ কিছুটা পথ হেঁটে পানিতে চাষাবাদ পদ্ধতির অনেক কাঠামো এবং সেচের জন্য তৈরি পুকুর দেখাতে নিয়ে গেলেন। এগুলো স্থানীয় জনতা সরকারেরই করা। চাষাবাদ করতে গিয়ে সেখানে কী কী সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে সেই সম্পর্কে কমরেড নিতি আমাদের কিছুটা ধারণা দিলেন। মাত্র ২ শতাংশ ভূমি সেখানে সেচের আওতায় আনা গেছে। বছরদশেক আগেও আভুজমাদ অঞ্চলে জমি চাষ সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। অন্যদিকে গাদরিচলিতে উচ্চফলনশীল বীজ আর রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। কমরেড বিনোদ বলল, 'আমাদের কৃষি বিভাগের জন্য জরুরি সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা এমন সব লোক চাই যাদের বীজ, জৈব বালাইনাশক ও সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা আছে। সামান্য একটু সাহায্য পেলে আমরা অনেক বড় কিছুই করতে পারি।'

জনতা সরকারের আওতাধীন অঞ্চলের চাষাবাদ দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কৃষক হচ্ছেন কমরেড রামু। তিনি আমাদের বেশ গর্বের সঙ্গেই চারদিক ঘুরিয়ে দেখালেন যেখানে ধান, বেগুন, বাঙ্গুরা, পেঁয়াজ, ওলকপি প্রভৃতি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। একই রকম গর্বের ভাব নিয়ে বিশাল একটি শুকনো পুকুরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এটি কি? এটির মধ্যে বর্ষাকালে কোনো পলি পড়ে না। পুকুরটি একটি ভুল জায়গায় কাটা হয়েছে বলেই তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, এটি আমরা করিনি! এটি কেটেছে লুটি সরকার (যে সরকার লুণ্ঠন করে)। এখানে পাশাপাশি দুটি সরকারের শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। একটি হলো জনতা সরকার, অন্যটি লুটি সরকার। কমরেড বেনুর কথা আমার মনে পড়ল। বেনু বলেছিল : তারা যে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় সে কেবল ওই খনিজসম্পদের জন্যই নয়, এই কারণেও তারা আমাদের শেষ করে দিতে চায় যে, আমরা পৃথিবীর সামনে একটি বিকল্প জীবনব্যবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

তবে বন্দুকের জোরে গ্রামস্বরাজ স্থাপনের যে ধারণাটি আমাদের মধ্যে কাজ করছে সেটিও কিন্তু এখনো কোনো আদর্শ বিকল্প হিসেবে দাঁড়ায়নি। ক্ষুধা আর স্বাস্থ্যহীনতা এখনো এখানে ব্যাপকভাবে জেঁকে বসে আছে। তারপরও নিশ্চিত করেই বলা যায়, এরই মধ্যে একটি বিকল্প জীবনব্যবস্থার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেছে। সেই বিকল্পটি অবশ্য সারা বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য নয়। আলাস্কা কিংবা নতুন দিল্লির জন্য তো নয়ই। এমনকি ছত্তিশগড়ের সব এলাকার জন্যও তা নয়, এটি কেবল তার নিজের জন্যই, কেবল এই দন্ডকারণ্যের জন্য। এটি সারা বিশ্বের জন্য অতীব এক গোপন সংবাদ। এখন যে ব্যবস্থাটি আছে সে নিজেই নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বিকল্প একটি ব্যবস্থা জন্ম দেওয়ার ভিত্তিটি তৈরি করে রেখেছে। সে ইতিহাসকে রুখে দাঁড়িয়েছে। সর্বোচ্চ প্রতিকূলতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়েছে, নিজেকে মিলিয়ে রাখার রূপরেখাটি প্রণয়ন করেছে। তার এখন দরকার সাহায্য আর স্বাপ্নিকতা, দরকার প্রচুর ডাক্তার, শিক্ষক, কৃষক। যুদ্ধ দরকার নেই তার। তবে কেবল যুদ্ধই যদি তার পাওনা হয়, সে কিন্তু তা মোকাবিলা করবে।

পরের কয়েকদিন আমি কেএএমএসের কাজে জড়িত নারীদের সঙ্গে দেখা করলাম। দেখা হলো জনতা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, দন্ডকারণ্য আদিবাসী কিষাণ মজদুর সংগঠনের (ডিএকেএমএস) বিভিন্ন সদস্য, নিহতদের পরিবারের সদস্য এবং একেবারেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে যারা এই ভীতিকর সময়গুলোতেও স্বাভাবিক জীবনযাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

দেখা হলো মুখিয়ারি, সুকদাই ও মুক্কালি নামের তিন সহোদরার সঙ্গেও। নারায়ণপুর জেলার বাসিন্দা এই তিন বোনের কাউকেই তরুণী বলা যায় না। তিনজনের বয়সই চল্লিশের ঘরে। বারো বছর যাবৎ তারা কেএএমএসের কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত। গ্রামের লোকজন পুলিশকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তাদের ওপর খুব নির্ভর করে। সুক্কালি বলল, পুলিশ দল বেঁধে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ জনের মতো করে আসে। তারা সবকিছু নিয়ে চলে যায়। গয়নাগাটি, মোরগ- মুরগি, শূকরছানা, হাঁড়িপাতিল, তীর- ধনুক সব। এমনকি ছোট একটি চাকুও তারা ফেলে যায় না। ইন্নারে তার বাড়িটি দুই দফা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একবার নাগা ব্যাট্যালিয়নের সৈন্যরা আর একবার সিআরপিএফ। সুখিয়ারি একবার গ্রেফতার হয়ে সাত মাস জেল খেটেছিলেন জাগদলপুরে। পুলিশ একবার গ্রামের সব মানুষকে তারা নকশাল – এই অভিযোগে ধরে নিয়ে যায়। সুখিয়ারি তখন গ্রামের সব নারী ও শিশুকে নিয়ে তাদের পিছু পিছু রওনা দেয়। তারা থানা ঘেরাও করে রাখে এবং বলে, সব পুরুষ মানুষকে না ছাড়া পর্যন্ত তারা সেখান থেকে নড়বে না। সুখদাই বলল, যখনই তারা গ্রামের কাউকে ধরে নিয়ে যায় তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং সেটি করতে হবে পুলিশ তার ব্যাপারে কোনো প্রতিবেদন তৈরি করার আগেই। একবার যদি পুলিশ তার খাতায় এ ব্যাপারে কোনো প্রতিবেদন লিখে ফেলে তখন তাকে ছাড়িয়ে আনাটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

সুখিয়ারি ছোটবেলায় অপহৃত হয় এবং জোর করে তাকে এক বয়স্ক লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় (তবে সে পালিয়ে চলে এসে বোনের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে)। এখন সে জনসমাবেশের আয়োজন করে, সভা- সমাবেশে বক্তৃতা দেয়। পুরুষরা তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তার ওপর নির্ভর করে। আমি জানতে চাইলাম, পার্টিকে সে কীভাবে দেখে। উত্তরে সুখিয়ারি জানাল, নকশালবাদ কা মতলব হামারা পরিবার (নকশালবাদ হলো আমাদের পরিবারের মতো)। কোনো আক্রমণের সংবাদ শুনলেই মনে হয় আমার পরিবার যেন আক্রান্ত হয়েছে। আমি জানতে চাইলাম, মাও কে ছিলেন তা সে জানে কিনা। একটু লজ্জা পেয়ে সে হাসল, তিনি ছিলেন একজন নেতা, আমরা তো তার স্বপ্নের পথ ধরেই হাঁটছি। কমরেড মোমারি গাওড়ির সঙ্গেও আমার দেখা হলো। মাত্র ২০ বছর বয়স। এরই মধ্যে দুই বছর জেল খেটেছে সে জগদলপুরে।

২০০৭ সালের ৮ জানুয়ারি সে ইন্নার গ্রামেই ছিল। সেদিন ৭৪০ জন পুলিশ এসে পুরো গ্রামটিকে ঘিরে ফেলেছিল। তাদের কাছে তথ্য ছিল, কমরেড নিতি সেখানেই অবস্থান করছে (সে ছিল ঠিকই তবে তারা পৌঁছবার আগেই চলে যায়)। তবে গ্রাম মিলিশিয়া দলটি তখনো ওখানেই ছিল। মোমারিও এই দলটির একজন সদস্য। সকাল হতেই পুলিশ গুলি ছুড়তে শুরু করে। তারা সুকলাম গাউড়ি এবং কাচরু গোতা নামে দুটি ছেলেকে হত্যা করে। এরপর তারা দুসরি সালাম, রানাই নামে দুটি ছেলে ও মোমারিকে আটক করে। দুসরি ও রানাইকে বেঁধে রেখে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। মোমারিকে এতটাই পেটানো হয় যে, তার প্রাণ যাওয়াটাই শুধু বাকি ছিল। পুলিশ ট্রেইলারসহ একটি ট্রাক্টর নিয়ে এল এবং মৃতদেহগুলো সেটির ওপর চড়াল। মোমারিকেও সেই মৃতদেহের সঙ্গে ওঠানো হলো এবং নারায়ণপুরে নিয়ে যাওয়া হলো। কমরেড দিলিপের মা চামরির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। দিলিপ ২০০৯ সালের ৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। সে জানাল, ছেলেকে হত্যা করার পর পুলিশ তার ছেলের মৃতদেহটি একটি পশুকে বাঁধার মতো করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে। পরে মৃতদেহটি তারা সঙ্গে করেই নিয়ে যায়। (অন্য

কেউ হত্যার দাবিদার হওয়ার আগেই অর্থ পুরস্কার পাওয়ার জন্য তাদের কর্তৃপক্ষের সামনে মৃতদেহ হাজির করতে হয়)। চামরি থানা পর্যন্ত পুলিশের পিছু পিছু ছুটল। থানায় পৌঁছতে পৌঁছতে মৃতদেহটির গায়ে সামান্য পরিমাণ কাপড়ও আর অবশিষ্ট ছিল না। যাওয়ার পথে চামরি জানাল, পুলিশ চা- বিস্কুট খাওয়ার (এর জন্য তারা কোনো পয়সাই দেয়নি) জন্য একটি ধাবায় এসে থামে। এ সময় তারা তার ছেলের মৃতদেহটি রাস্তার পাশে ফেলে রাখে। একবার কল্পনা করুন তো দৃশ্যটি। একজন মা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিতে থাকা তার ছেলের মৃতদেহের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে। একপর্যায়ে তাকে আবার একটা জায়গায় থামতেও হয়েছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তার ছেলের হত্যাকারী কখন তাদের চা পান শেষ করবে তার জন্য। তারা অবশ্য মৃতের যথাযথ সৎকার যাতে করা যায় সে জন্য ছেলের মৃতদেহটি মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়নি। তারা শুধু যে গর্তের মধ্যে ওই দিন নিহত অন্যদের সঙ্গে তার ছেলেকেও চাপা দেওয়া হয়েছিল সেই গর্তের ওপর একমুঠো মাটি ছুড়ে দেওয়ার সুযোগ তাকে দিয়েছিল। চামরি জানায়, সে প্রতিশোধ নিতে চায়। বদলা কা বদলা। রক্তের বদলে রক্ত।

আমি মার্সকোলা জনতা সরকারের নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে দেখা করি। তাদের আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা ছয়। তাদের মুখ থেকে পুলিশি হামলার একটি বর্ণনা শুনি। রাতের বেলা ৩০০ থেকে ৪০০ পুলিশের একটি দল আসে। কখনো কখনো এ সংখ্যা ১ হাজারও হয়। তারা পুরো গ্রামটি ঘের দিয়ে ফেলে অপেক্ষা করতে থাকে। সকাল হতেই যেসব মানুষ সর্বপ্রথম মাঠে যাওয়ার জন্য বের হয় তাদেরই তারা আটক করে। এরপর তাদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে গ্রামের ভেতর ঢুকতে শুরু করে। তারা তাদের কোথায় কোথায় বুবিফাঁদ রয়েছে সেগুলোও দেখিয়ে দিতে বলে (বুবিফাঁদ এখন একটি গুন্ডি শব্দে পরিণত হয়েছে। বুবিফাঁদ কথাটি উচ্চারণ করার সময় কিংবা শব্দটি কারো কাছে শোনার সময় তারা সবাই সব সময়ই মুচকি মুচকি হাসে। সারা জঙ্গলই বুবিফাঁদে ভরা। এর কোনোটা আসল, কোনোটা আবার নকল। এমনকি পিএলজিএ'র সদস্যদেরও গ্রাম অতিক্রম করার সময় বুবিফাঁদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হয়)। গ্রামে ঢোকার পরই পুলিশ লুটতরাজ, চুরি এবং ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ শুরু করে। তারা তাদের সঙ্গে কুকুরও নিয়ে আসে। যারা দৌড়ে পালাতে চায় কুকুর গিয়ে তাদের ধরে ফেলে। কুকুরগুলো মুরগি ও শূকরছানাগুলোকে তাড়িয়ে বেড়ায় আর পুলিশ সেগুলোকে হত্যা করে বস্তায় পুরে নিয়ে চলে যায়। বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তারাও পুলিশের সঙ্গে আসে। তারা জানে মানুষজন তাদের টাকা- পয়সা, গয়নাগাটি কোথায় লুকিয়ে রাখে। তারা লোকজনকে ধরে নিয়ে চলে যায় এবং ছাড়ার আগে তাদের কাছ থেকে টাকা- পয়সা কামিয়ে নেয়। পাছে খুন করার মতো কাউকে পেয়ে যায় এই ভেবে তারা তাদের সঙ্গে সব সময়ই বাড়তি কিছু নকশালি পোশাকও রাখে। নকশাল হত্যা করতে পারলেই তারা টাকা পায়। সুতরাং কাউকে মেরে তারা তাকে নকশাল বানিয়ে ফেলে। মানুষজন ঘরে থাকতে সাংঘাতিক ভয় পায়। আপাত চেহারার শান্ত নীরব এই অরণ্যে জীবনযাত্রার সবটারই এখন সামরিকীকরণ ঘটে গেছে। জনগণ এখন যে শব্দগুলোর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সেগুলো হলো ঘেরাও এবং খোঁজা, গুলিবর্ষণ, এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে আসা, বসে পড়া, আক্রমণ ইত্যাদি। ফসল ফলাতে গেলেও পিএলজিএ'র কর্মীদের কাছ থেকে নিরাপত্তা টহল চেয়ে নিতে হয়। বাজারে যাওয়া এখন সামরিক অভিযানের পর্যায়েই পড়ে।

বাজারগুলোতে এখন মুখবিররা (গুপ্তচর) গিজ গিজ করছে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে পুলিশ এদের টাকার লোভ দেখিয়ে সংগ্রহ করেছে (মাসিক ১৫০০ রুপিতে)। আমাকে জানানো হলো, নারাইনপুরে একটি মুখবির মহল্লা (গুপ্তচরপল্লী) আছে। সেখানে অন্তত হাজার চারেক মুখবিরের বাস। পুরুষরা এখন আর বাজারে যেতে পারে না। মেয়েরা যায় তবে তাদের ওপরও খুব কাছ থেকেই নজরদারি চলে। এমনকি তারা কোনো একটি সওদা একটু বেশি কিনলেই পুলিশ অভিযোগ করে, তারা এগুলো নকশালদের জন্য কিনছে। ওষুধের দোকানগুলোতেও বলে দেওয়া আছে কারো কাছে যেন অতিসামান্য পরিমাণের চেয়ে

এতোটুকু বেশি ওষুধ বিক্রি না করা হয়। গণসরবরাহ ব্যবস্থার কম মূল্যের জিনিসপত্র (পিডিএম), চিনি, চাল, কেরোসিনের গুদামগুলো হয় থানার মধ্যে কিংবা থানার কাছাকাছি কোনো জায়গায় স্থাপন করা আছে যাতে করে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই সেখানে গিয়ে কেনাকাটা করা সম্ভব না হয়। গণহত্যা সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ এবং শাস্তি প্রদানবিষয়ক জাতিসংঘ সনদের ২ নম্বর ধারায় : কোনো জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, গোত্রগত কিংবা ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে আংশিক কিংবা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নেওয়া নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ যেমন সেই জনগোষ্ঠীর সব মানুষকে মেরে ফেলা, তাদের ওপর ভয়াবহমাত্রায় শারীরিক কিংবা মানসিক নির্যাতন চালানো, পুরো বা আংশিক জনগোষ্ঠী যাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে তেমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি করা, জনগোষ্ঠীর মধ্যে বংশবৃদ্ধি বন্ধ করার লক্ষ্যে নেওয়া পদক্ষেপসমূহ, কিংবা জোর করে এক জনগোষ্ঠীর শিশুদের অন্য জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার যে কোনোটিকেই অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। দীর্ঘ পরিক্রমণ এবার বুঝি সত্যি সত্যি আমাকে কাবু করে ফেলেছে। আমি ক্লান্ত। কমলা আমার জন্য এক ঘটি গরম জলের ব্যবস্থা করল। আমি একটি গাছের আড়ালে অন্ধকারের মধ্যে স্নান সেরে নিলাম। কিন্তু রাতের খাবার খাওয়া কিংবা একটু ঘুমানোর জন্য ব্যাগের ভেতর ঢোকার সুযোগ পেলাম না। কারণ কমরেড রাজু ঘোষণা দিলেন, এখনই আমাদের যাত্রা করতে হবে।

এ কথা ঠিক, এমনটা প্রায়ই হচ্ছে। তবে আজ রাতের ব্যাপারটি খুবই কষ্টকর ঠেকছে। আমরা একটা খোলা চারণভূমিতেই তাঁবু গেড়ে ছিলাম। দূরেই বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমরা মোট ১০৪ জন। আবারো রাতের অাঁধারে এক একজন করে সারিবদ্ধভাবে চলা। ঝিঁঝির ডাক, বাতাসে সুগন্ধী গাছের ঘ্রাণ। যে জায়গায় আজ আমরা রাত কাটাব সেখানে পৌঁছতে ১১টার বেশিই বেজে গেল। পাহাড়ের পাদদেশের একটি চাতাল। আবারো একত্রিত হওয়া, নাম ডাকা। কেউ একজন রেডিওর সুইচটি অন করল। বিবিসি জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের লালগড়ে পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত রাইফেলসের একটি ক্যাম্পে আক্রমণ চালানো হয়েছে। মোটরসাইকেলে করে এসে ৬০ জন মাওবাদী এ হামলা চালায়। ১৪ পুলিশ নিহত, ১০ জন নিখোঁজ, অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। সবার মুখে আনন্দজনক বিড়বিড় শব্দ। মাওবাদী নেতা কিষেণজির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। কবে আপনারা এই সন্ত্রাস বন্ধ করে দিয়ে আলোচনায় বসবেন? যখনই অপারেশন 'গ্রিন হান্ট' বন্ধ করা হবে। যে কোনো সময়। চিদাম্বরমকে জানিয়ে দিন আমরা কথা বলব। পরের প্রশ্ন : এমন অন্ধকার, আপনারা স্থল মাইন পেতে রেখেছেন। নতুন করে আবার সৈন্য আনা হচ্ছে, আপনারা কি তাদের ওপরও আক্রমণ চালাবেন? কিষেণজি : হ্যাঁ, অবশ্যই, তা না হলে জনসাধারণ আমাকে পেটাবে। আবারো সবার মুখে হাসি। সুখদেব ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন, 'তারা সব সময় স্থলমাইনের কথা বলে। আমরা কিন্তু আসলে স্থলমাইন ব্যবহার করি না। আমরা ব্যবহার করি আইইডি।'

হাজার তারকা হোটেলে আবারো একটি বিলাসবহুল কক্ষ। আমি অসুস্থ বোধ করছি। বৃষ্টি নামছে। একটা হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কমলা আমার শরীরের ওপর একটা ঝিল্লি টেনে দিল। এর চেয়ে বেশি আর কি চাই আমার। আশপাশে সবাই যার যার ঝিল্লির নিচে আশ্রয় নিচ্ছে। পরদিন সকালেই লালগড়ে নিহতের সংখ্যা ২১- এ গিয়ে দাঁড়াল এবং নিখোঁজের সংখ্যা ১০। আজ সকালে কমরেড রাদুকে একটু সদয়ই মনে হলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সেখানে থাকতে পারলাম। একরাতে লোকজন একটি আলোর চারদিকে পতঙ্গের মতো জড়ো হলো। তারা আসলে সোলার প্যানেল চালিত কমরেড সুখদেবের কম্পিউটারে মাদার ইন্ডিয়া চলচ্চিত্রটি দেখছিল। তাদের রাইফেলের নলগুলোর ছায়ার প্রতিফলন চোখে পড়ছিল। কমলার এসব ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম ছায়াছবি দেখতে সে পছন্দ করে কিনা। নেহি দিদি, সিরদ এমবুস ভিডিও (না দিদি, কেবল এমবুসের ভিডিও)। পরে আমি কমরেড সুখদেবের কাছে এই এমবুশ ভিডিও সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। মুহূর্তের

মধ্যে তিনি আমাকে দেখানোর জন্য একটি ভিডিও চালু করে দিলেন। শুরুতেই দন্ডকারণ্যের দৃশ্যাবলি। নদী, ঝরনা, খুব কাছ থেকে নেওয়া পুষ্পপত্রহীন গাছের ছবি, পাখির কিচিরমিচির। এরপর হঠাৎই দেখা গেল একজন কমরেড তারে জড়ানো একটি আইইডি শুকনো পাতার নিচে লুকিয়ে রাখছে। একটি মোটরসাইকেল শোভযাত্রা মুহূর্তের মধ্যে উড়ে গেল। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানবদেহের খন্ড-বিখন্ড অংশ আর পোড়া মোটরসাইকেলগুলো। অস্ত্রগুলো কেড়ে নেওয়া হল। বোমাতঙ্কে ভিতবিহ্বল তিনজন পুলিশকে বেঁধে ফেলা হলো। কে এই ছবি তুলেছে? অভিযানটি পরিচালনা করছে কে? আটক পুলিশরা যদি আত্মসমর্পণ করে তবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে মর্মে কেইবা বারবার আশ্বাস দিচ্ছিল? (পরে জেনেছিলাম তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল)। আমি জানি আশ্বাস প্রদানকারী সেই কণ্ঠস্বরটি কমরেড বেনুর। কমরেড সুখদেব বললেন, এটা হচ্ছে কুদুর এমবুশ। পুড়িয়ে দেওয়া গ্রাম, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এবং নিহতদের আত্মীয়- স্বজনের ভিডিও সম্বলিত একটি আর্কাইভ রয়েছে তার কাছে। একটি পোড়াবাড়ির দেয়ালে লেখা আছে 'নাগা! হত্যার জন্যই জন্ম নিচ্ছে!' বাস্তারে অপারেশন গ্রিন হান্ট শুরু করার সময় ছোট্ট একটি ছেলের আঙ্গুলগুলো যে কেটে নেওয়া হয়েছিল সেই দৃশ্যও এখানে আছে। (এমনকি আমার একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের ভিডিও চিত্রও আছে। আমার পড়াশোনা আমার বইপত্র। বিস্ময়কর!)

রাতে রেডিওতে আরো একটি নকশাল আক্রমণের খবর প্রচারিত হলো। এটি বিহারের জাফুইতে। খবরে বলা হয়, ১২৫ জন মাওবাদী একটি গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে কোরা সম্প্রদায়ের ১০ জন মানুষকে হত্যা করেছে। হত্যাকান্ডটি প্রতিশোধমূলক। কারণ কোরাদের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করেই এর আগে পুলিশ ৬ জন মাওবাদীকে হত্যা করে। হ্যাঁ, একথা ঠিক, খবরটি সত্যও হতে পারে কিংবা মিথ্যাও হতে পারে। তবে যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কমরেড রাজু ও কমরেড সুখদেবের চোখে মুখে একটি অস্বস্তির ভাব স্পষ্টতই লক্ষ্য করা গেল।

ঝাড়খন্ড এবং বিহার থেকে বেশ গোলমেলে সব সংবাদই আসছিল। ফ্রন্সিস ইন্দুবার নামে একজন পুলিশের মাথা কেটে নেওয়ার ভয়াবহ স্মৃতি সবার মনে এখনো জাগরুক। সুশৃঙ্খল একটি সশস্ত্র সংগ্রাম কতো সহজেই না অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের লুমপেন কর্মকান্ডে হারিয়ে যায় কিংবা জাতপাত ও ধর্মীয় বিভাজন থেকে সৃষ্ট জঘন্য যুদ্ধের রূপ নেয় এই ঘটনা সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারত রাষ্ট্রটি অন্যায়- অবিচারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের মাধ্যমে দেশটিকে ভয়াবহ অস্থিতিশীলতা জন্ম দেওয়ার মত একটি বিস্ফোরকের বাক্সে পরিণত করেছে। সরকার যদি মনে করে থাকে, পরিকল্পিত হত্যাকান্ড চালিয়ে সিপিআইকে (মাওবাদী) নেতৃত্বহীন করে দিয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করবে তবে তা হবে একটি ভুল সিদ্ধান্ত। বিপরীতে যা ঘটবে তাহলো সন্ত্রাস আরো বিস্তার লাভ করবে, তীব্র হবে এবং এক সময় সরকার আলোচনার জন্যও আর কাউকে খুঁজে পাবে না।

দন্ডকারণ্যে আমার অবস্থানের শেষের কয়েকটি দিন আমরা সবুজ- শ্যামল চমৎকার ইন্দ্রাবতী উপত্যকার এখানে- ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। একটি পাহাড়ের গা ঘেঁষে হাঁটার সময় চোখে পড়লো আরো একদল মানুষ আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই যাচ্ছে। কিন্তু তারা হেঁটে চলেছে নদীর অপর পার ধরে। জানতে পারলাম তারা কুদুর গ্রামে বাঁধবিরোধী সমাবেশে যোগ দিতে যাচ্ছে। তারা প্রকাশ্যেই হেঁটে চলেছে এবং তাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। উপত্যকা রক্ষার জন্য স্থানীয়দের একটি সমাবেশ। এক লাফে আমি নৌকায় চড়লাম। নদী পেরিয়ে যোগ দিলাম তাদের সঙ্গে।

গত কয়েকদিন ধরে যে এলাকাটা দিয়ে আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি তার পুরোটাই বোধঘাট বাঁধের কারণে তলিয়ে যাবে – এই জঙ্গল, এর ইতিহাস, একে ঘিরে তৈরি হওয়া সব গল্প- কাহিনী। একশ'রও বেশি

গ্রাম রয়েছে এখানে। এই তাহলে পরিকল্পনা? লুহান্দিগুদার সমন্বিত ইস্পাত কারখানা এবং কেশলখালঘাটের বকসাইট খনি ও এলুমিনিয়াম শোধনাগারের পাশ দিয়ে নদীর প্রবাহ তৈরি করার জন্যই এই মানুষগুলোকে ইঁদুরের মতো ডুবিয়ে মারা হবে?

বহু বছর যাবত যেসব কথা আমরা শুনে এসেছি। মাইলের পর মাইল হেঁটে এসে সমাবেশে যোগ দেওয়া মানুষও সেসব নিয়েই কথাবার্তা বলছে। আমরা ডুবে মরবো, তবু এখান থেকে একচুল নড়ব না। দিল্লি থেকে কেউ একজন তাদের এই সমাবেশে যোগ দিয়েছে জানতে পেরে তারা বেশ রোমাঞ্চই অনুভব করলো। আমি তাদের বললাম, দিল্লি এক নিষ্ঠুর নগরী। সেখানে কেউ তাদের সম্পর্কে কিছু জানে না, অথবা জানলেও এসব ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দেয় না।

দন্ডকারণ্যে আসার সপ্তাহ কয়েক আগে আমি গুজরাটে গিয়েছিলাম। সরদার সরোবর বাঁধ এখন মোটামুটি পূর্ণ উচ্চতায়ই নির্মিত হয়ে গেছে। এই বাঁধের ব্যাপারে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (এনবিএ) সে সময় যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল সে সবের সবগুলোই একে একে ফলে গেছে। বাঁধের কারণে যেসব মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছিল তাদের পুনর্বাসন হয়নি এবং এ নিয়ে কেউ কোনো কথাও বলছে না। খালগুলোও তৈরি করা হয়নি। টাকা- পয়সারও কোনো খবর নেই। ফলে শুকিয়ে যাওয়া সবরতী নদীর (এটিতেও বহু আগেই বাঁধ দেওয়া হয়েছিল) মধ্য দিয়েই নর্মদার জলপ্রবাহকে চালিত করা হচ্ছে। এই প্রবাহের বেশিরভাগ পানিই শুষে নিচ্ছে শহর আর বড় আকারের শিল্প কারখানাগুলো। নদীর অভাবে ভাটির দিকের মোহনায় লবণাক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

একটা সময় বড় বাঁধগুলোকে আধুনিক ভারতের মন্দির হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সেটি ছিল আসলে ভুল ধারণা এবং সম্ভবত সে সময় সেটা বোঝাও গিয়েছিল। কিন্তু আজকের দিনে এতসব কিছু ঘটে যাওয়ার পর এবং সব কিছু জানার পর আমাদের বলতে হবে, আসলে বড় বাঁধগুলো হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে এক একটি অপরাধ। স্থানীয় অধিবাসীদের বাধার মুখে ১৯৮৪ সালেই বোধঘাট বাঁধ নির্মাণের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন এটাকে থামাবে কে? এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনই বা রহিত করবে কে? বেহাত হয়ে যাওয়ার হাত থেকে ইন্দ্রাবতীকেই বা রক্ষা করবে কে? তবে কেউ না কেউ তা করবে। শেষ রাতটিতে একটি পাহাড়ি ঢালে আমরা আমাদের তাঁবু খাটালাম। পরদিন সকালেই পাহাড় বেয়ে একটি রাস্তায় গিয়ে উঠব যেখান থেকে একটি মোটরসাইকেল আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অরণ্য এখন অনেকটাই বদলে গেছে। এমনকি আমি যেদিন প্রথম এখানে ঢুকি সেদিনের চাইতেও চিরঞ্জি, রেশম এবং আমের মুকুল ফুটতে শুরু করেছে।

কুদুর গ্রামের লোকেরা সদ্য ধরা বড় একঝুড়ি মাছ ক্যাম্পের জন্য পাঠিয়ে দিল। আর আমার জন্য পাঠিয়েছে ৭১টি ফল, সবজি, ডাল আর পোকা- মাকড়ের দীর্ঘতালিকা। এগুলো তারা জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে এবং নিজেদের ক্ষেতে ফলায়। সঙ্গে এগুলোর বাজার দরও। এটি নেহাতই একটি তালিকামাত্র। তবে এর ভেতর দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার একটি মানচিত্রও কিন্তু অাঁকা হয়েছে।

জঙ্গলের চিঠি এলো। আমার জন্য দুটি বিস্কুট। কমরেড নর্মদার পাঠানো একটি কবিতা ও ভাজ করা একটি ফুল আর ম্যাসির কাছ থেকে চমৎকার একটি চিঠি। (ম্যাসি কে? আর কি কখনো তা জানতে পারব?)

কমরেড সুখদেব আমার আইপড থেকে একটি গান তার কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নিতে চাইল। আমরা রেকর্ডিংয়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি শিল্পী ইকবাল বানুর কণ্ঠে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের 'হাম

দেখেঙ্গে' (আমরা দিনের আলো দেখব) গানটির। জিয়াউল হক শাসনামলে নির্যাতন-নিপীড়ন যখন চরমে তখন এটি গাওয়া হয়েছিল লাহোরে অনুষ্ঠিত স্মরণীয় এক কনসার্টে।

জব আহল-ই-সাদা-মারদুদ-ই-হারাম

মসনদ পে বিথায়ে জায়েঙ্গে

গণবিরোধী আর ধিকৃতরা

উচ্চাসনে বসলে

সব তাজ উচালে জায়েঙ্গে

সব তখত গিরায়ে জায়েঙ্গে

সব মুকুট ছিনিয়ে নেয়া হবে।

সিংহাসনচ্যুত করা হবে।

হাম দেখেঙ্গে

আমরা দেখব।

উপস্থিত পঞ্চাশ হাজার দর্শক-শ্রোতার প্রতিবাদী কণ্ঠে সেদিনের সেই পাকিস্তানে হতে লাগল : ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! এত বছর পর সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এই অরণ্যের সর্বত্র। বিস্ময়ের বিষয় সেদিনের সেই মৈত্রী আবারো তৈরি হয়েছে।

ভুল করেও যারা মাওবাদীদের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বস্তুগত সহায়তার হাত বাড়াচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোপনে তাদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। ইকবাল বানু খুব ভুল কিছু কি বলেছেন? ভোর হতেই আমি কমরেড মাধব ও জুরি এবং ছোট্ট মাংতুসহ অন্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কমরেড চান্দু বাইক জোগাড় করে গেছে। সে আমার সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত আসবে। কমরেড রাজু অবশ্য আসবে না। (পাহাড়ে চড়তে গেলে তার হাঁটুর দফারফা হয়ে যাবে)। কমরেড নিতি (পুলিশ যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে), কমরেড সুখদেব, কমলা এবং অন্য আরো পাঁচজন মিলে আমাকে পাহাড়ের উপরটায় নিয়ে যাবে। আমরা হাঁটতে শুরু করার পর হঠাৎ করেই, তবে একইসঙ্গে নিতি এবং সুখদেব তাদের একেগুলোকে গুলি ছোড়ার জন্য প্রস্তুত করে ফেলল। এই প্রথম তাদের এমনটা করতে দেখলাম। আমরা সীমান্তের দিকে যাচ্ছি। সুখদেব হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জানেন, গোলাগুলির মধ্যে পড়লে আমাদের কি করতে হবে? হ্যাঁ, আমি বললাম, কী আর, দ্রুতই অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে যাওয়া। সে একটি পাথরের ওপর বসে পড়ে হাসতে লাগল। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে বড় রাস্তার ঠিক নিচটায় একটি পাথুরে চোরাকুঠুরির মতো জায়গায় আমরা এসে বসলাম। বাইরে থেকে একেবারেই আমাদের দেখা যাচ্ছিল না। অনেকটা যেন ওঁৎপাতা অবস্থা। আমরা বাইকের শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। এটি এসে গেলে দ্রুতই বিদায় পর্বটি সারা হবে। লাল সালাম কমরেড।

www.freebanglabooks.com

পেছন ফিরে দেখি তারা তখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ধরা ছোট্ট একটি রুমাল। হাত নাড়ছে। রুমালটিও আন্দোলিত হচ্ছে বাতাসে। এই মানুষগুলো একটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের সঙ্গেই তাদের বসবাস। অথচ বাইরের জগতের কাছে এরা এক মূর্তিমান আতঙ্ক। প্রতি রাতেই আমি আমার এই ভ্রমণটি নিয়ে ভাবি। সেই নিশুতি আকাশ, সেই বুনো পথ। ভেসে উঠছে কমলার ছবি। আমার টর্চের আলোয় চোখে পড়ছে তার পায়ের গোড়ালি। চপ্পল পায়ে টেনে- হেঁচড়ে পথ চলছে সে। আমি নিশ্চিত, এখনো তার চলা থামেনি। এ চলা কেবল নিজের জন্য নয়, এ চলা আমাদের সবার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

www.freebanglabooks.com